দীপ চাহে শিখা

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

রেসনস্
৯৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ ঃ
বৈশাখ, ১৩৬১

প্রকাশক ঃ
কালবেলা
৬৫, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলকাতা-৬

মুদ্রণ
শ্রী রণজিৎ কুমার জানা
নিউ গঙ্গামাতা প্রিন্টিং
১৯ডি / এইচ / ২৬ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

দীপ চাহে শিখা

বিজয়াদশমী!

এরকম আনন্দের দিন জীবনে কমই আসে! সর্বত্র আনন্দের ঢেউ—পথের দিকে তাকিয়ে তাই দেখছিল রমলা।

অসংখ্য ছেলেমেয়ের নানা রঙের পোশাক পরে পথ জুড়ে চলেছে প্যাণ্ডেলের দিকে। সেখানে রমলাই দিয়েছে হাজার টাকা চাঁদা।

টাকা তার আছে, দিয়েছে—বেশি কি আর দিয়েছে এমন? কিন্তু কেন দিল? না দেওয়াই তো উচিত ছিল তার। পাড়াতে সুনাম হবে, সকলেই বলবে—রমলা খুব দাতা, খুব ভক্তিময়ী, খুব পরার্থ পর মেয়ে।

কিন্তু কি দরকার এই সুনামের? খুব অন্যায় করেছে রমলা। অতগুলো টাকা দেওয়া উচিত হয়নি তার। না দিলেই ভালো হতো—এই সব কথাই ভাবছিল রমলা।

আজ চার-পাঁচদিন রমলার স্বামী বাড়িতে নেই। পুজোর কোনও আনন্দই জাগলো না ওর জীবনে। নিঃসঙ্গ দিন ক'টা শুধুমাত্র জানালা দিয়ে পুজো মন্ডপ দেখেই কাটিয়ে দিল। অবশ্য একবার সে গিয়েছিল মন্ডপে পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্যে। তবে সে আর কতক্ষণ?

কিছুই ভালো লাগছে না রমলার। স্বামীর আজ ফেরার কথা। গাড়ি গেছে স্টেশনে—হয়তো আধঘণ্টার মধ্যে এসে যাবে বিমল। আসুক। নইলে এভাবে একা কাটানো রমলার পক্ষে খুব কষ্টকর।

চাকর-ঝি যতই থাক—রমলা একা। স্বামী ছাড়া আর কেউ নেই—না পুত্র, না কন্যা। বহু চেষ্টা করেও সে সন্তানের জননী হতে পারলো না আজও। অদৃষ্ট!

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এর মধ্যেই প্রতিমা নিরঞ্জন আরম্ভ হয়ে গেছে। কত

রকমের আলো, কী অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত করে বিশ্বজননীকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা—দেখে আশা মেটে না। দেখছে সবাই—ছেলে-বুড়ো সকলেই।

মনের অবস্থা ভালো না থাকলেও রমলা তাই দেখছিল—বিশেষত দেখছিল ছেলে-মেয়ের দলকে। রঙিন প্রজাপতির মতো সুন্দর—মরসুমী ফুলের বিচিত্র বর্ণ—ঝরণার কাকলির মতো মধুর ওই শিশু-প্রবাহকে।

নিতান্ত বাচ্চা একটা ছেলে হাত দুটি বাড়িয়ে 'মা মা' করছে তারই দরজার কাছে। সুন্দর ছেলেটি। রমলার ইচ্ছে করছে, এক্ষুণি নীচে নেমে ওকে কোলে তুলে নেবে। কিন্তু ওই যে সুবেশা একটি তরুণী ছুটে এলো—তুলে নিল বাচ্চাটাকে! চুমা দিলো তার মুখে। দেখলো রমলা।

কী অপরূপ মাতৃত্ব ওই কাঁচাবয়সী মেয়েটার চোখেমুখে। রমলার প্রাণে তো অমন মাতৃত্ব জাগবে না—মা না হলেও বস্তু জাগে না। দূর হ'! রমলা সরে এলো জানালা থেকে।

সরে এলেই কি মন শান্ত হয়? না—রমলা চোখ মুছল। গাড়িটা এসে থামলো দরজায়। স্বামী এলেন—খবর শোনবার জন্যে উৎকণ্ঠিতা রমলা অপেক্ষা করছে—শুনতে পেল শিশুর কাকলি।

কে? এ বাড়িতে শিশুর কাকলি কেমন করে আসবে? আশ্চর্য! হ্যাঁ, শিশুই—কোলে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো বিমল।

একটি মেয়ে—দুধে-আলতায় রঙ—চমৎকার মুখশ্রী। গায়ে একটা লাল টুকটুকে সিল্কের ফ্রক—কচি হাত বাড়িয়ে বলছে মা, মা!

—কে? কার মেয়ে?

বলতে বলতে রমলা হাত বাড়ালো। খুকিও চলে এলো কোলে। গাল দুটি একটু টিপে হাসিমুখে রমলা আবার শুধালো—কোথায় পেলে? কার মেয়ে?

—মেয়ে এখন তোমারই। বলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিমল বললো—ওর মা মহাষ্টমীর দিন মহাযাত্রা করেছে। বন্ধুটি বিব্রত ওকে নিয়ে। কোথায় রাখবে, কি করবে ভাবছিল। তাই বললাম, আমাকেই দে—রমলাই ওকে মানুষ করবে—পারবে তো তুমি?

—পারবো না কেন? এমন ঘর আলো-করা মেয়ে—কি নাম?

—চিনি—চিন্ময়ী! তবে চিনিই ওকে বলে ওর বাবা।

—খুব ভালো। চিনি খুব ভালো নাম। তোমার বন্ধু তাহলে আবার বিয়ে করবেন, কেমন?

—তা করবে বৈকি! তার বয়স তো আমার থেকে বেশি নয়—বত্রিশ মাত্র।

—বেশ, তিনি যা খুশী করুন। তবে পরে তিনি এ মেয়ের ওপর তাঁর অধিকার দাবী করবেন না তো?

—না। সে তার সব অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। ও এখন তোমার।

খুশীতে ঝলমলে হয়ে উঠলো রমলা! মেয়েটা তার গলায় দু'হাত জড়িয়ে পরম নিশ্চিন্তে বুকের ভেতরে শুয়ে রয়েছে।

কী কোমল স্পর্শ! কী অপরূপ আনন্দময় অনুভূতি! রমলার বুভুক্ষু বুক জুড়িয়ে গেল।

—তুমি জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও। আমি একে নিয়ে একবার মা-দুর্গার কাছে গড় করিয়ে আনি।

—যাও। আমার জন্যে কোনও চিন্তা নেই। যাও, প্রণাম করে এস।

রমলা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল চিনিকে বুকে নিয়ে! মাত্র মিনিটখানেক সময় লাগলো বিশ্বজননী দশভুজার পূজামণ্ডপে যেতে।

রমলা দেখলো, বিসর্জনের পূর্বে পাড়ার সব মেয়ে বিশ্ব-মায়ে বিদায়-পূর্ব জলযোগ করাচ্ছেন। বহু বিচিত্র-বেশ নারী-কুমারী-তরুণী-প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধারাও এসেছেন। বাঁড়ুজ্যেবাড়ির মেজগিন্নী সকলের সুপরিচিত এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজনীয়া। রমলাকে দেখেই বললেন,

—এসো মা, এসো। বাঃ, কি সুন্দর মেয়েটি! কার মেয়ে?

—আমার স্বামীর এক বন্ধুর মেয়ে! ক'দিন আগে এর মা মারা গেছে।

—আহা! তাহলে কি হবে! কোথায় থাকবে মেয়েটি?

থাকবে আমার কাছেই। ওকে মানুষ করবার ভার আমিই নিলাম।

—খুব ভালো করেছো মা—ওর পরে তোমার নিজেরও ছেলেমেয়ে হোক।

কথাটা বললে মেজগিন্নী। স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বামীসেবায় এবং সকলের কল্যাণের কাজে সাধ্যমতো সাহায্যের জন্যে ইনি এই পাড়ায় খ্যাতিসম্পন্না। এঁর কথা

শুনে রমলার মনে অগাধ আশা জেগে উঠলো। এই চিনির পয়ে তার নিজের ছেলে-মেয়েও তো হতে পারে!

হয়ও তো এমন—অনেক ক্ষেত্রেই হয়।

রমলা দুর্গাপ্রতিমার কাছে প্রার্থনা করলো—মেজগিন্নীর কথা যেন সত্যি হয় মা। ও চিনিকে প্রণাম করালো এবং আর যা করাবার করালো। দীর্ঘক্ষণ পরে ঘুমন্ত চিনিকে বুকে নিয়ে ফিরে এলো রমলা।

—কেমন লাগছে? বিমল বললো।

—ভালো, খুব ভালো! ওর জন্যে কালই একটা বাচ্চা-গাড়ি কিনে দাও। আর কিছু জামা-কাপড়।

—জামা-কাপড় ওর আছে—এনেছি! গাড়ি কিনে নিও কাল!

—আচ্ছা!

চিনিকে বুকে নিয়ে ঘুমলো রমলা সেদিন।

পরদিন থেকেই রমলা আরম্ভ করলো মেয়ের জন্যে নানা ব্যবস্থা। তার রকমারি পোশাক তো নিলোই—নিজেও তৈরী করলো কত রকমের। রকমারি পুতুলে আর খেলনায় বোঝাই করে ফেললো বাড়িখানা। দোলনা থেকে প্যারাম্বুলেটার পর্যন্ত এলো—আর এলো একটা শক্তসমর্থ ঝি—যার মাই-দুধ চিনি খেতে পারবে। অর্থাৎ রমলা মেয়েটাকে সুন্দরভাবে মানুষ করবার জন্যে কোনো ত্রুটিই রাখলো না। নিজের মেয়েকেও অতখানি যত্নে কেউ মানুষ করে না। বলে না দিলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে, চিনি তার নিজের মেয়ে নয়।

পাঁচ বছর পড়তেই রমলা মহাসমারোহ করে হাতে-খড়ি দিল চিনির। মাষ্টার রাখল ভালো একজন, তাকে পড়াবার জন্যে। সেই সঙ্গে নাচ-গানও যাতে চিনি শিখতে পারে, তার ব্যবস্থাও করলো সে। অভাব তার নেই। স্বামী তার বিত্তবান, অতএব কোনও ত্রুটিই রাখলো না কোনোদিক থেকে।

ঠিক এই সময় রমলার হোল একটি মেয়ে। চিনির মতো সুন্দরি না হলেও মেয়ে তার ভালোই হয়েছে দেখতে। রমলা নাম মিলিয়ে মেয়ের নাম রাখলো মৃণ্ময়ী অর্থাৎ মিনি।

চিনি-মিনি বড় হচ্ছে। পাড়ার লোকেদের প্রায় সবারই ধারণা যে, ওরা দু-

বোন। মিনি দু'বছরের হতে না হতেই রমলার একটি পুত্র জন্মাল। রমলা নাম রাখলো হিরণ্ময়।

অতঃপর চিনি-মিনি-হিরণ শুক্লপক্ষের শশীর ন্যায় দিন-দিন বাড়তে লাগলো। চিনির বয়স সাত—মিনির দুই—হিরণের মাস-কয়েক মাত্র। ভালোই চলেছে ওদের জীবনযাত্রা।

হঠাৎ সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে চিনি দাঁড়ালো রমলার কাছে। মুখখানা শুকনো—চোখদুটো ছলছল করছে।

—কি হলো? রমলা জিজ্ঞাসা করলো।

—কে জানে?

—দেখি। রমলা গায়ে-গলায় হাত দিল, কপাল দেখলো। তারপর বললো—জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। যাও, চুপ করে শুয়ে থাকগে।

চিনি এসে নিজের ছোট্ট বিছানায় শুয়ে পড়লো। জ্বর—বেশি জ্বর। চোখ লাল হয়েছে—মাথা ঘুরছে, সর্বাঙ্গ টলছে। রাত কতো কে জানে?

চিনি জ্বরের ঘোরে উঠে পড়লো। ওপাশে মা'র ঘরে যাবে। হঠাৎ পড়ে গেল বারান্দায়—মাগো!

চীৎকারটা শুনে তখনি ওর কাছে শুয়ে থাকা ঝি উঠলো। সে এসে দেখলো চিনি পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেছে। রমলাকে ডাক দিল সে। গভীর ঘুম থেকে জেগে রমলা বিরক্তির সুরে বললো,

—হলো কি?

—চিনি জ্বরের ঘোরে উঠে এসেছিল। হঠাৎ পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। জ্বর খুব বেশি। আপনি আসুন মা।

রমলা উঠে এলো। উঠে এলো বিমলও। চিনিকে তুলে আনা হলো তার বিছানায়। ফোন করে গৃহ-চিকিৎসককে ডাকা হলো। তিনি এসে বললেন—জ্বরটা খারাপ—সম্ভবত টাইফয়েড রূপ নেবে। পড়ে যাওয়ায় খুব খারাপ হয়েছে। ডান হাত চেপে পড়েছে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একে জ্বরাতিসার বলে—সাবধান থাকবেন।

ডাক্তার ওষুধ-ইনজেক্সন যা দেবার দিয়ে চলে গেলেন।

উঠে অবশ্য এসেছিল রমলা, তবে অনেক পরে। কারণ, হিরণের শরীর

ভালো নেই। তাকে ঘুম পাড়াতে অনেকটা রাত হয়েছিল সেদিন—ডাক্তার এলে পর তবে রমলা এসেছিল।

উঠতে দেরি হওয়ার জন্যে লজ্জিত হওয়া উচিত ওর, কিন্তু লজ্জার কোনো রকম চিহ্ন রমলার মুখে দেখা গেল না। বরং সে বিরক্তই হলো নিজের ছেলের শরীর ভালো নেই বলে—তারপর এই ঝামেলা! কেমন যেন অস্বস্তিতে ভরে তুলেছে ওর মন—তবু সে এলো, দেখলো চিনিকে।

অজ্ঞানে চিনি 'মা মা' করছে। মাথায়-কপালে হাত দিল রমলা। জ্বর খুব বেশি নেই—আঘাতের জন্যেই অচৈতন্য হয়ে গেছে চিনি।

ওষুধ-ইন্‌জেকশন চলতে লাগলো যথারীতি—জ্ঞানও হলো। কিন্তু ডান হাতটা নাড়তে পারছে না—কাঁদছে।

ডাক্তার দেখে বললেন—হয়তো হাতখানা চিরদিনের মতো অকর্মণ্য হয়ে যাবে।

এতবড় একটা বিপদের কথা চিন্তা করেনি বিমল বা রমলা। কিন্তু বিপদ আসার আগেই যখন আশঙ্কা হলো, তখন তাকে মেনে নিতে হয়। উপায় কিছু নেই, তবু বিমল চিনির বাবাকে খবর দিল।

চিনির বাবা এর মধ্যে দ্বিতীয়বার 'দার' পরিগ্রহ করেছেন এবং এই কয়েক বছরে দু'তিনটি পুত্র-কন্যার পিতাও হয়েছেন। তিনি লিখেছেন, চিনির সব ভার তুমি নিয়েছ। অতএব তার আর কিছু করবার নেই। আরও কারণ, সৎমা কখনও তার সেবাযত্ন করবে না...

আশ্চর্য এই যে চিনিকে চোখের দেখা দেখবার জন্যেও তিনি এলেন না একদিনের জন্যে।

বিমল খুবই দুঃখিত হলো। রমলা বললো—সৎমা হয় জানি, সৎবাবা হয় জানতাম না।

রমলার রাগ এইজন্যে যে, চিনির বাবা এসে ওকে নিয়ে গেলে তার বহু ঝঞ্ঝাট বেঁচে যেত। এই ফালতু ঝামেলা রমলা যেন সহ্য করতে পারছে না। কারণ চিনির অসুখ সারছেই না—দিনে দিনে বাড়ছে।

প্রায় তিন মাস পরে ডাক্তার জানালেন—চিনির ডান অঙ্গ অর্থাৎ হাত এবং পা অসাড় হয়ে আসছে। ওকে যেন নড়তে দেওয়া না হয়। নড়লে আর সারাবার উপায় থাকবে না।

ডাক্তার যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন অদূরে শায়িতা চিনি শুনছিল। 'হাত-পা যেন না নড়ে। নড়লে আর ভালো হবে না' ইত্যাদি সবই শুনলো চিনি। তার শিশু-মনে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভাবলো তার হাত-পা অবশ হয়ে গেছে।

অর্থাৎ চিনি সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে গেল। ওর দ্বারা পৃথিবীর কোনো কাজই হবে না, অথচ বেঁচে থাকবে, আর তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শুধু টাকাই নয়, বিস্তর হেফাজতের দরকার হবে। এর মধ্যেই তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে—ডাক্তার, ওষুধ, আর ঝি-চাকর-নার্সের বাড়াবাড়িতে।

এতসব বাড়াবাড়ি পছন্দ করছে না রমলা। কিন্তু বিমল এই সব ব্যবস্থা করেছে। চিনির অসুখ মাসখানেক পরেই রমলা প্রস্তাব করেছিল, তাকে কোনও ইনভ্যালিডদের হোমে দেওয়া হোক। খরচ যা লাগবে সবই দেওয়া হবে। বিমল সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, বরং কথাটায় আপত্তি করেছিল।

বিমল সম্পন্ন ব্যক্তি। ব্যবসা তার ভালো চলে এবং চিনি আসার পর থেকে আরো ভালো চলছে। পৈত্রিক ভবন ছাড়া আরো দু'খানা বাড়ি এর মধ্যে করেছে বিমল, দু' মেয়ে অর্থাৎ চিনি-মিনির জন্যে।

রমলা এতটা পছন্দ করে না। যে রমলা একদিন চিনির জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল আজ তার এই পরিবর্তন বিমলের চোখ এড়ায়নি। কিন্তু কিছু করবার ছিল না। জানা কথা এই রকমই হয়।

বিমল নিজে সব সময় চিনির তদ্বির করে। প্রতি সকালে সে তার কাছে এসে বসে—চা খাওয়ায়। অফিস যাওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা করে তবে যায়। অফিস থেকে ফেরার সময় প্রতিদিন সামান্য কিছু একটা আনে—খাবার, না হয় খেলনা, অথবা বই।

বই পেলেই চিনি খুশি হয়। তাই বেশির ভাগ দিন বই-ই আনে, বিমল। নানা রকমের বই—গল্প থাকে, বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী থাকে, দেশ-বিদেশের বহু তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ কাহিনীও থাকে। আর থাকে ভারতের মহান পুরুষ ও নারীর জীবন-কাহিনী।

পড়ায় অত্যন্ত আগ্রহ চিনির। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ার পরেই তার এই অসুখ। পড়া এখন বন্ধ আছে, কিন্তু বিমল একদিন প্রস্তাব করলো—

—পড়তে চাস চিনি?

—হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ আমি পড়ব। পড়াবে না আমায়?

—নিশ্চয় পড়াব মা। যতটা তোর ইচ্ছে, ঘরে বসেই পড়বি।

পরদিন বিমল বন্দোবস্ত করলো প্রাইভেট পড়ার। কিন্তু বাদ সাধলো রমলা। বিরক্ত হয়ে বললো,

—এখন ওই ঘরটাতেই পাঠশালা খুলবে নাকি?

—না, তোমার কোনো চিন্তা নেই। ওকে আমি তিনতলার ছাদের ঘরে তুলে দিচ্ছি, সেখানেই ও থাকবে। ঘর একটা আছে, ছাদটা পাবে আর পাবে মুক্ত আকাশ।

এই বলে বিমল দু'জন চাকর দিয়ে চিনিকে তুলে আনলো চিলে-কোঠার সংলগ্ন ঘরটায়। আলো পাখা ছিল না, করিয়ে দিল। খাট-বিছানা, টেবিল-চেয়ার আলমারি সবই আনিয়ে দিল। আর দিল একটা চার-চাকার গাড়ি। রবার দেওয়া চাকা-যার ওপর বসে চিনি ছাদটার সর্বত্র ইচ্ছামতো ঘুরতে পারবে বাঁ-হাত আর বাঁ-পা দিয়ে প্যাডেল চালিয়ে।

একজন ঝি রাখলো সর্বক্ষণ তাকে দেখবে। সকাল-সন্ধ্যায় দু'জন মাষ্টার এসে পড়িয়ে যাবে। সব ব্যবস্থাই পাকা করে দিল বিমল, রমলার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও। বিমল গ্রাহ্য করলো না তার কোনও কথা। চিনি বয়সে যতই ছোট হোক, বুদ্ধি তার কিছু কম নেই। সে দেখলো, বুঝলো এইসব ব্যাপার, আর মা-বাবার কথার মধ্যে জেনে ফেললো বিমল বা রমলা তার সত্যিকার বাবা-মা নয়।

অতটুকু মেয়ের মনে এই সত্যি কথাটা কম আঘাত করেনি। তবু বিমলের অগাধ স্নেহ-যত্ন ভালোবাসায় চিনির সয়ে গিয়েছিল সেটা। কিন্তু সেদিন হঠাৎ সে শুনতে পেল,

—ওকে দিয়ে হবে কি? ওতো আর ভালো হবে না। ডাক্তার বলেছে, ডান অঙ্গ ওর চিরদিনের জন্য অবশ হয়ে গেল। এখন সারাজীবন ওকে নিয়ে দগ্ধে মর।

—মরতে তোমাকে হবে না, রমলা। আমি ওকে এনেছিলাম, মরতে হয় আমিই মরবো। তোমার ইচ্ছে হয়তো দিনান্তে একবার ওর খবর নিও, ইচ্ছে না হয় তো নিও না। কোনও অনুযোগ আমি করবো না তা নিয়ে।

—বেশ, তাই হবে। যা খুশী করো গিয়ে। আমি কিন্তু ওই বারোমেসে রুগীর সেবা করতে পারবো না।

—না, তোমায় করতে হবে না। বলেই বিমল চিনির জন্যে চিলে-কোঠার সংলগ্ন ঘরটার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

চিনি এ জীবনে আর ভালো হবে না, এ সত্য সে জেনে ফেলেছে। ডান পা, ডান হাত সে নাড়তে পারে না—নাড়েও না। ডাক্তারের নিষেধ ছিল বরাবর। তাঁর আদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

এখন আর ডাক্তার আসে না।

চিনির ধারণা, হাত-পা নাড়লে সে বাঁচবে না। মরতে তার বড় ভয় করে। কে জানে, মরলে আরও কত কষ্ট হবে? আবার হয়তো কোন্ পাতানো মা-বাবার হাতে গিয়ে পড়বে; হয়তো খেতে পাবে না সেখানে সে—হয়তো মারধোর জুটবে বরাতে। তা শিশু-মনে এইসব নানা চিন্তার উদয় হয়। তাই মরতে তার ইচ্ছে নেই।

পড়তে চায়, কারণ তাছাড়া কিছু আর করবার নেই। আর সারাদিন, সারারাত শুয়ে শুয়ে কি কাটানো যায়? তাই বিমলের পড়ার প্রস্তাব চিনি সাগ্রহে গ্রহণ করলো।

টিউটর আসেন সকালে একজন—বিকেলে অন্য একজন। পড়ান তাঁরা চিনিকে—খুব যত্ন করেই পড়ান। এঁরা দুজনেই বৃদ্ধ—অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তাছাড়া সন্ধ্যায় আসেন একজন দিদিমণি—চিনিকে গান শেখান।

বিমল কোনো ত্রুটি রাখেনি চিনির জন্যে। পড়ানো এবং গান শেখানোর সব ব্যবস্থা করার পরে ছাদের ওপর একটা বাগান তৈরি করিয়ে দিল—দোলনা খাটিয়ে দিল—খাঁচার মধ্যে কয়েকটা পাখী রেখে দিল। দিন কয়েক হলো একটা টব সমেত কতকগুলো রঙিন মাছ কিনে এনেছে বিমল—সেটা রাখলো চিনির ঘরের একপাশে।

বলা বাহুল্য, এসব রমলার প্রীতিপদ নয়, কিন্তু বলা চলে না। বললেও শুনবে না বিমল। চিনিকে ও শুধু ভালোবাসে না, নিজের ছেলেমেয়ের থেকেও বেশি ভালোবাসে। অফিস থেকে ফিরে ও সটান চলে যায় চিনির ঘরে। ওকে আদর করে, তার জন্যে আনা কিছু উপহার দিয়ে তবে আসে নীচে।

একা চিনির জন্যে যা খরচ হচ্ছে, রমলার দুটো ছেলেমেয়ের জন্যে তা হয় না। ওরা কিছু চাইলে বলে,

—তোমার মাকে বলোগে, কিনে দেবে।

—বাবার কাছ থেকেও ওদের কিছু পেতে সাধ জাগে, বুঝলে? রমলা ঝঙ্কার দেয়।

—হ্যাঁ, বিমল শান্তস্বরে বলে—ছাদের ওই মেয়েটারও মা'র স্নেহ পেতে সাধ জাগে।

রমলা চুপ করে যায়। কারণ, বিমল অল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বেশি কথা সে বলে না, তবে যতটুকু বলে, নির্মম ভাষায় বলে। রমলা থই পায় না। সে যে চিনি সম্বন্ধে এতখানি উদাসীন, এ সত্য রমলার নিজের জানা। তাই নিজেকে সে ও বিষয়ে যথাসাধ্য এড়িয়ে রাখে, কারণ এটা অপরাধ।

নিঃসন্তান রমলার কোলে যেদিন চিনি এসেছিল, সেই দিনটা বিমল স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল একদিন কথা প্রসঙ্গে।

—নারীর আত্মীয়তা শুধু আত্মজনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। পুরুষের আত্মীয়তা পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণুতে। নারী এইজন্যে সীমিতা—অসীমের সন্ধান সে পাবে কি করে?

কথাটার এমন একটা জ্বালা ছিল যে, রমলা বেশ কিছুক্ষণ মূক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল,

—নারীর বিশ্বপ্রেম কি নেই বলতে চাও?

—আছে কোটিতে একটি। তুমি অন্তত তার মধ্যে পড় না।

রাগে লাল হয়ে উঠেছিল রমলা। কিন্তু কিছু সে বলতে পারে নি। ভেবেছিল, নিজের ব্যবহারটাকে কিছুটা উদার করে চিনির সম্বন্ধে খানিকটা স্নেহ সহানুভূতি দেখাবে সে। করেও ছিল কয়েকদিন সে-চেষ্টা; কিন্তু মনে যার স্নেহ নেই, বাইরের আচরণকে সে ক' দিন ঠিক রাখতে পারে? অল্প ক' দিন পরেই আবার চিনির সম্বন্ধে রমলা উদাসীন হয়ে উঠলো।

এই নিয়ে হয়তো বিমলের সঙ্গে রমলার মন-কষাকষি হতে পারতো, কিন্তু

হলো না। তার কারণ, বিমলের সতর্কতা। সে নিঃশব্দে রমলার সব কিছু সহ্য করে একাই চিনির জন্যে সব ব্যবস্থা করে যাচ্ছে।

চিনির ডান-অঙ্গ অবশ, তাই বাম হাতে তাকে লেখা অভ্যাস করতে হলো। অল্প বয়স তার, অসুবিধা হলো না। স্বল্পায়াসে তা আয়ত্তে এলো। বাঁ-হাতে ভালোই লিখে যায় এখন সে, ঠিক ডান হাতের মতোই স্বচ্ছন্দে।

গলা ভালো—গানও ভালোই শিখেছে চিনি। তার যথেষ্ট আগ্রহ—ভালোভাবেই পড়ছে। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করলো সে প্রাইভেটে তিন বছরের মধ্যে।

রমলার ছেলেমেয়েরাও বড় হচ্ছে। তারাও পড়ছে। বেসিক থেকে বড় স্কুলে পড়তে এলো তারা। মিনি পড়ে ক্লাস ফাইভে, আর হিরণ পড়ে ক্লাস টু-তে। ওদের জন্যেও এবার গৃহশিক্ষক রাখা দরকার।

রমলা নিজেই একজন শিক্ষিকাকে নিযুক্ত করলো। কিন্তু মিনি বা হিরণ তাঁর কাছে পড়তে রাজী নয়। তারা পালিয়ে আসে এবং একেবারে ছাদের ঘরে উঠে যায় চিনির কাছে।

—দিদি, ওই যে মাস্টারনী এসেছে, ওর কাছে পড়াশোনা হবে না।

—কেন? কেন রে?

—ওর কাছে পড়বো না। তোমার কাছে পড়বো।

—মা বকবেন। যাও পড়োগে।

—না, গল্প বলো। পড়া এখন থাক।

—মা বকবেন। বলে, চিনি বারবার মা'র বকুনির ভয় দেখায়। কিন্তু মিনি বা হিরণ শোনে না।

না যাওয়ার জন্যে রমলা ওদের বকাবকি করবে, জানা কথা। তথাপি চিনি খুবজোর করতে পারে না এইজন্যেই যে, ওই ভাই-বোন দুটি তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে।

ওরা সব সময় চিনির কাছে থাকতে চায়। খেলা তো করেই। যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ওরা নানারকম গল্প শোনে—রূপকথা, বিজ্ঞানের কথা, বিচিত্র দেশ আর জন্তু-জানোয়ারের কথা। বহু রঙিন বই—বহু খেলনার পুতুল

আছে চিনির। সেগুলো মিনি আর হিরণ পায় ওর কাছ থেকে—এও একটা মস্ত প্রলোভন।

রমলা অবশ্য খুবই বিরক্ত হয়, কিন্তু উপায় নেই। ছেলেমেয়েদের দিদি-অন্ত প্রাণ। তারা সুবিধে পেলেই চলে যায় চিনির কাছে। তাতে রমলার একটা মস্ত সুবিধা ছেলেমেয়েদের ঝঞ্ঝাট তার কম হয়।

ওপরের চিলে-কোঠার সংলগ্ন ঘরখানা এবং তৎসংলগ্ন ছাদটি চিনির থাকবার এবং বেড়াবার জায়গা। সঙ্গী মাত্র মিনি আর হিরণ। তাই ওদের খুবই ভালো লাগে তার। আর মিনি হিরণও দিদির কাছ-ছাড়া হতে চায় না, গল্প এবং খেলনার লোভে।

বাবা অফিস থেকে ফিরে সর্বাগ্রে চিনির খবর নেবেন, এ তো স্বতঃসিদ্ধ। কোনওদিন এর ব্যতিক্রম হয় না। রমলার খুবই খারাপ লাগে সর্বাগ্রে চিনির খবর নিতে যাওয়া। অনুযোগের অন্ত থাকে না, কিন্তু বিমল গ্রাহ্য করে না। সে নিঃশব্দে তার কর্তব্য হিসাবেই এটা করে যায়। তার মনে হয়, ছোট্ট শিশু চিনিকে সে কন্যাস্নেহে রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই এনেছিল একদিন। সে কর্তব্য সর্বাবস্থাতেই মেনে চলতে হবে তাকে।

চিনি পড়ছে। বুদ্ধি তার প্রখর। পাশ করে চলেছে বারবার। গানও শিখছে ভালোই। বিমল ওকে একটা ভালো চাকরি জুটিয়ে দেবে, এই তার ইচ্ছে।

প্রফেসারি চাকরি হলেই ভালো হয়। তাই এম. এ. পরীক্ষার আগে বিমল তাক সাবধান করে দিল, সে যেন ভালোভাবে পাশ করতে পারে। ফাষ্ট ক্লাস পেলে খুবই ভালো হয়। তাহলে প্রফেসারি পাওয়া সহজ হবে। সেইজন্য বিমল দু'জন নাম করা প্রফেসর রেখে দিল চিনিকে পড়াবার জন্যে মোটা মাইনে কবুল করে। এই ব্যাপার দেখে রমলা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। মুখখানা বিকৃত করে বললো,

—নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে একটা বুড়ো পণ্ডিত, আর কোথাকার কে তার জন্যে তিনশ' টাকা মাইনের প্রফেসর! লজ্জাও করে না!

—লজ্জা তোমারই পাওয়া উচিত রমলা। তুমি এতটা নীচ আমি জানতাম না। কিন্তু শোন, তোমার ছেলেমেয়ের ধনসম্পত্তির অংশ চিনি নেবে না। শুধু তাকে আমি একটু ভালোভাবে মানুষ করে দিতে চাই, যাতে সে তার ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট না পায়। এটুকুও তুমি সহ্য করবে না।

—অত কিসের জন্য। যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। এখন বিদেয় করে দাও। যাঁর মেয়ে তিনি নিয়ে যান।

—আমি যখন এনেছি তখন আমারই মেয়ে। বিদেয় করা আর সম্ভব নয় এখন। অবশ্য ওর চাকরি হলে ও আপনিই চলে যাবে।

আপন সন্তানের জন্যে ভালো ব্যবস্থা কিছু করতে পারে না রমলা। অবশ্য একথা সত্য যে, মন্দ ব্যবস্থা কিছু নেই মিনি বা হিরণের জন্যে। কিছুমাত্র ত্রুটি রাখেনি বিমল। তাদেরও সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ, পড়াশোনার ব্যবস্থা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সবই ঠিক আছে। অধিকিন্তু তারা বাড়ির বাইরে যেতে পারে, নানারকম খেলাধূলো আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেয়। চিনির সম্বল মাত্র ছাদের এই ঘরখানি, আর তারই সংলগ্ন কৃত্রিম উদ্যান, মাথার ওপর আকাশ, আর পড়ার জন্যে বই, মাস্টার এবং সঙ্গীতচর্চার সামান্য সরঞ্জাম।

ঈর্ষা বা হিংসার কোনো কারণ নেই, তবু রমলার ঈর্ষা জাগে। তার মনে হয়, ওই কোথাকার কে মেয়েটা এসে তার আপন সন্তানদের ন্যায্য প্রাপ্যটুকু কেড়ে নিয়ে, ভাগ বসাচ্ছে। ওকে বিদায় করতে পারলেই সুখী হয় রমলা।

আশ্চর্য মানুষের মন—বিশেষ করে নারীর মন। এই রমলাই একদিন চিনিকে বুকে নিয়ে গর্বভরে ঘুরে বেড়িয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীকে সগর্বে বলেছে, চিনি তার নিজের মেয়ে। কিন্তু থাক্‌ সেকথা।

সংসারে যা হবার তাই হয় রমলার ঈর্ষা হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিমল চিনিকে আত্মজা দুহিতা অপেক্ষা কিছু কম স্নেহের চোখে দেখে না; বরং বেশি স্নেহ পড়েছে তার চিনির ওপর, এইজন্যে রমলা আরো ক্রুদ্ধ হয়।

তবু সবই ঠিকমতো চলেছে।

চিনি এম-এ পাশ করলো। খুবই ভালো ফল করলো সে। প্রফেসার হওয়া আশ্চর্য নয় এখন। কিন্তু চিনির বয়স অত্যন্ত কম, মাত্র তেইশ বছর। তাছাড়া তার দক্ষিণ-অঙ্গ পঙ্গু। তাই বিমল ভাবলো, যাক, আরো দু-এক-বছর। চিনি আরো কিছু পড়ুক— গানটা আরো ভালো করে শিখুক, তারপর দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে তার নিজের ছেলেমেয়ে যথেষ্ট বড় হয়ে উঠেছে। তারা যথাক্রমে ক্লাস নাইন এবং ক্লাস সেভেনে পড়ছে। ওদের জন্যে ভালো টিউটর রাখা দরকার। তাই একদিন রমলা বললো,

—ভালো একজন মাস্টার এনে দাও মিনির জন্যে। এবার সে ক্লাস টেন-এ উঠবে। তোমার ওই বুড়ো পণ্ডিতের দ্বারা আর চলবে না। বুঝেছ?

—বুড়োরা খুব ভালো পড়ান রমলা। তাঁরা অভিজ্ঞ টিচার।

—তোমার এই বুড়ো মেয়েটির জন্যে যত ইচ্ছে বুড়ো অভিজ্ঞ টিচার রাখ। আমার মেয়ের জন্যে জোয়ান মাস্টার চাই।

কেন?

—কারণ আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি পালটেছে। পড়ার আর পড়ানোর রীতিনীতি বদলেছে। এমন কি বানানভঙ্গি এবং উচ্চারণভঙ্গিও বদলেছে। আমি চাই বর্তমান যুগের উপযোগী শিক্ষক।

—ভালো, তাই হবে। দিন-সাতেকের মধ্যে জোগাড় করে দিচ্ছি। বলে, বিমল তার অফিসে গেল যথারীতি। সেদিন বড়বাবু তাকে কিছুটা চিন্তিত দেখে বললেন,

—আপনাকে আজ যেন অন্যমনস্ক দেখছি স্যার?

—না...হ্যাঁ। একটা টিউটর জোগাড় করে দিন তো।

—কি রকম টিউটর চান?

—বর্তমান যুগের উপযোগী জোয়ান টিউটর।

—যে আজ্ঞে। আছে একটি আমাদের পাড়ায়! মা-বাপ-হারা ছেলে—খুবই ভালো ছেলে। নিজের চেষ্টায় পড়েছে—বরাবর বৃত্তি পেয়েছে। কোথায় যেন প্রফেসারির জন্যে চেষ্টা করছে। তাকেই বলে দেখি। মাইনে কত বলবো?

—যা তিনি চান তাই দেওয়া হবে। তবে মেয়েটাকে পাশ করাতে হবে।

—আচ্ছা। আমি কালই কি তাকে আনব এখানে?

—আনবেন।

বললো বিমল। কিন্তু তার খুব ইচ্ছে ছিল না। তবে রমলাকে থামাবার জন্যে ভালো একজন টিউটর না রাখলেই চলে না, তাই এই নতুন টিউটরকে আনতে বললো।

সন্ধ্যায় বাড়ি এসেই বিমল জানিয়ে দিল, কাল থেকে মিনি-হিরণের জন্যে নতুন টিউটর আসবেন। প্রতি সন্ধ্যায় এসে পড়াবেন দু'ঘণ্টা। সকালে অবশ্য ওই বুড়ো পণ্ডিতমশাই রোজ পড়াবেন।

—ওঁকে আবার কেন?

—ওঁকে জবাব দিতে পারবো না। যতদিন উনি থাকবেন, থাকুন।

বলে, বিমল চলে গেল রমলাকে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই।

মিনি আর হিরণ শুনলো মা-বাবার কথাগুলো। তারা তখুনি ছাদে উঠে গেল।

হিরণ দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বললো,

—শুনেছিস দিদি, আমাদের নতুন মাস্টার আসবেন কাল।

—তাই নাকি? কেন? যাদববাবু চলে যাবেন?

—না, যাদববাবু বুড়ো হয়ে গেছেন। তাই মা জোয়ান মাস্টার আনছেন।

—বেশ তো! তবে উনি অনেকদিন আছেন—

উনিও থাকবেন। সকালে উনি পড়াবেন, আর বিকেলে তুমি পড়াচ্ছো তো! এবার থেকে ওই নতুন মাস্টার পড়াবেন।

—বেশ ভাই, খুব ভালো। নতুন মাস্টারের কাছে পড়বে।

—না। তোর কাছেই তো ভালো পড়ছি দিদি।

—তাতে কি! আমার কাছে তো তুই সব সময় পড়ছিস—পড়বিও।

—না। তোর মত কে আমাদের ভালো করে পড়াবে? কেউ না। কেউ অমন ভাল করে পড়াতে পারবে না—মাস্টার চাইনে আমাদের।

—কি সব কুশিক্ষা দিচ্ছ ওদের?

বলতে বলতে রমলা এসে দাঁড়াল।

চমকে উঠল চিনি। বলল,

—কুশিক্ষা দিচ্ছি না, মা। ওদের নতুন মাস্টার আসবেন, ওরা তাই বলেছে।

—আসবেই তো! তোমাকে আর পড়াতে হবে না। সন্ধ্যেটা গল্প শুনে রোজ ওরা নষ্ট করে তোমার কাছে।

—না মা। এরা পড়ে—পড়ে আমার কাছে।

—পড়ে কতো তা আমি জানি বাছা। শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না। তোমাকে আর পড়াতে হবে না। যা, যা, তোরা নীচে যা—

রমলা ধমক দিল মিনি আর হিরণকে।

হিরণ বললো,

—না, যাবো না। দিদির কাছে পড়বো—গল্প শুনবো, যা খুশী করবো। যাবো না—

—হিরণ! প্রচণ্ড ধমক দিল রমলা।

কিন্তু হিরণ অত্যন্ত দুরন্ত ছেলে। সে গ্রাহ্য করলো না দাবড়ানি। সটান টেবিল থেকে বই টেনে নিয়ে পড়তে বসল। বললো,

—দিদি, সেই ঘোড়ার গল্পটা পড়বো? সেই ঠ্যাঙ-ভাঙা ঘোড়া আর দরবেশ!

রমলা দেখলো ধমকে কোনো কাজ হবে না। হিরণের দেখাদেখি মিনিও বসে গেল পড়তে। সে একটা মোটা বই খুলে চীৎকার করে আরম্ভ করে দিল—

'নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে,

বাল্মীক, হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি...'

রমলা নিঃশব্দে নেমে গেল। কোনো উপায় নেই এখানে তার। চিনি যেন যাদু করেছে তার ছেলেমেয়েকে। ওদের দিদি-অন্ত প্রাণ। দিদি ছাড়া ওরা কিছুই ভাবতে পারে না। দিদির সঙ্গে ভাগ না করে ওরা কিছু খাবে না। দিদিকে না দিয়ে কোনও জামা-কাপড় ওরা পরতে চায় না।

কে জানে এসব তাদের কে শিখিয়েছে? সম্ভবত ওদের বাবা বিমল।

রাগটা কোনোরকমে সামলে নিল রমলা।

পরদিন বড়বাবু পাড়ার সেই ছেলেটিকে এনে হাজির করলেন বিমলের অফিসে। তার নাম মিহির। সুন্দর চেহারা। বয়স বড়জোর ছাব্বিশ-সাতাশ। এসেই প্রণাম করলো বিমলকে। 'কল্যাণ হোক' বলে আশীর্বাদ করলো বিমল। নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলো এবং শেষে জানালো যে তাঁর ছেলে-মেয়ে হিরণ আর মিনিকে প্রতি সন্ধ্যায় পড়াতে যেতে হবে।

নতুন মনিবকে দেখে মিহিরের মন্দ লাগলো না। সবিনয়ে বললো,

—কাল থেকেই কি আমি যাব স্যার?

—হ্যাঁ, কালই যাবে। ইচ্ছে করলে আজও যেতে পার।

—না স্যার, মাফ করবেন। আজ আমার ওই সময় একটা এনগেজমেণ্ট আছে।

—আচ্ছা। কাল [illegible] পাঁচটার সময় যাবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ; নমস্কার। বলে, চলে গেল মিহির।

চেয়ে দেখলো বিমল তার যাওয়া। সুন্দর শিক্ষিত ছেলে! বেশ লাগলো তাকে। রমলা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে নতুন মাস্টারকে দেখে।

চিনির জন্যে আর মাস্টারের প্রয়োজন নেই। সে এখন কৃতবিদ্য। তার জন্যে একটা ভালো চাকরি করে দিতে হবে। সেজন্যে বিমল যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, করবেও।

উপস্থিত গান-বাজনাটা ভালো করে চিনিকে শেখানো হবে! তার জন্যে একজন ভালো ওস্তাদ দরকার। মাইনে অবশ্য অনেক দিতে হবে—দেবার মতো ক্ষমতাও আছে বিমলের! কিন্তু আপত্তি হবে রমলার। চিনির জন্যে আর কিছু খরচ করতে সে নারাজ। কিন্তু কিছু একটা করা অবশ্যই দরকার চিনির জন্যে, নতুবা খারাপ দেখায়।

পরদিন মিহির যথাসময়ে এলো। নমস্কার জানালো রমলাকে। রমলা প্রস্তুত ছিল তার জন্যে। ও চেয়ে দেখলো নতুন মাস্টারকে। বললো,

—খুব ভালোই হলো। ওদের পড়াবার ভার আপনার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।

—আমার দ্বারা যতটা সম্ভব তার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে না মিসেস চৌধুরী।

—আসুন তাহলে।

বলে, রমলা মিহিরকে পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু মিনি আর হিরণের দেখা নেই।

—মিনি! হিরণ! বলে, অত্যন্ত বিরক্ত, এমন কি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সজোরে ডাক দিল রমলা।

—যাই মা!

কোন্ এক দূর থেকে যেন একটি ভীত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। একটু পরেই মিনি, হিরণ এসে হাজির হলো।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ? ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মতো রমলা গর্জন করে উঠলো।

এই তো আসছি!

—আসছিস তো! এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

—ছাদে।

—কেন গিয়েছিলি ছাদে? বলেছি না, মাস্টার মশাই আসবেন পড়াতে। খবরদার এ সময় কোথাও যাবিনে। যা, এক্ষুণি পড়তে বোস।

ভাই-বোন কেউ আর কথা কইলো না। নিঃশব্দে এসে তারা বসল।

—ওদের তাহলে দেখুন। পড়ান ভালো করে। কেমন?

—যে আজ্ঞে।

—বলে, মিহির তার কাজ আরম্ভ করলো।

আট-দশদিন পড়াচ্ছে মিহির। রমলা তার কাজে খুব খুশী। মিনি আর হিরণও খুব খুশী তাদের মাস্টার ভালো হওয়ায়। তাদের কাছে মিহির খুব ভালো মাস্টার। কারণ, মিহির বকা-ঝকা করে না। পড়া না হলে শুধু বলে—আরও সে ভালো করে পড়াবে'—তাই ভালো মাস্টার।

মিহির তার কর্তব্যকর্ম যথানিয়মে করে চলেছে। সেদিন এসে শুনলে, মিনি আর হিরণ মামার বাড়ি গেছে মায়ের সঙ্গে। ফিরতে দেরি হবে। বসে থাকবে, নাকি চলে যাবে ভাবছে। হঠাৎ সুমিষ্ট কণ্ঠের সুর কানে এলো।

কে গাইছে? এ বাড়িতে তো চাকর-ঠাকুর-ঝি ছাড়া আর কেউ নেই! কি জানি হয়তো পাশের বাড়িতেই হবে।

মধুমাখা সুরেলা গলা। কীর্তন গাইছে—সুললিত বিরহসঙ্গীত। শ্রীরাধার অন্তর-ব্যথা যেন মুক্তি পাচ্ছে ওই গানের সুরে-সুরে। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতে লাগলো মিহির তন্ময় হয়ে।

গান মিহির ভালোবাসে। সে গাইতে পারে না, বাজাতে পারে। গানটা শুনলো...শুনে বড় ভালো লাগলো তার।

নিশ্চয় এই বাড়ির কোথাও কেউ গান গাইছে, কিন্তু কোথায় তা জানা মিহিরের পক্ষে সম্ভব নয়।

বাড়িটা যথেষ্ট বড়। সামনে আর পিছনে বাগান আছে—ধারে-পাশে আরও অনেকের বাড়িও আছে। সুতরাং কোথায় গান হচ্ছে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হলো না।

এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে গেল। মিহিরের ইচ্ছে করছিল, কে গান গায় ওদের জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু এই কৌতূহল প্রকাশ করা ঠিক হবে না ভেবে প্রশ্ন সে করলো না। পড়ানো সেরে চলে গেল।

গান শুনতে খুব ভালোবাসে মিহির। তবে সে-গান ভালো গলার হওয়ার

দরকার। এইজন্যে সে বাছা-বাছা সঙ্গীত-শিল্পীদের গান শোনে। বিশেষ ধরনের মিষ্টি গলা না হলে ওর তৃপ্তি হয় না। আজ যার গান শুনে এলো, সে সত্যিই সুকণ্ঠি—কিন্নরকণ্ঠি। ওপরের কোনো ঘরেই সে গাইছিল। কিন্তু কোথায়? কে সে? মিহির ভাবতে লাগলো।

পরদিন মিহির একটু আগেই পড়াতে এলো। ইচ্ছা, যদি আবার এই গান শুনতে পায়। তার ছাত্র-ছাত্রী এখনও আসেনি। গানও কেউ গাইছে না। দেখা হলো বিমলের সঙ্গে। তাকে বসতে বলে সে চা দেবার ব্যবস্থা করতে গেল।

এক কাপ চা আর কিছু খাবার প্রতিদিনই দেওয়া হয় মিহিরকে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আর স্বয়ং রমলাই এলো চা-খাবার নিয়ে। এটা ব্যতিক্রম। কারণ রমলা নিজে এর আগে কোনোদিন ওটা নিয়ে আসেনি।

মিহির কিছু বিস্মিত হলো, তবে কিছু মনে করলো না। রমলা চা আর জলখাবার দিয়ে মিহিরের পারিবারিক খবর নিতে লাগলো।

রমলার সস্নেহ প্রশ্নের উত্তর মিহির জানাল যে, তার পরিবার বলতে বিশেষ কেউ নেই। দূর পল্লীতে তার জন্ম। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর মামার বাড়িতে মানুষ। বর্তমানে মামা-মামীই তার অভিভাবক। এখানে মামার কারবার আছে। খুব বড় কারবার নয়, কোনোরকমে চলে। মামা-মামীই তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং এ পর্যন্ত যা করবার তাঁরাই করছেন।

সব কথা শুনলো রমলা মন দিয়ে। ইতিমধ্যে হিরণ ও মিনি এসে গেছে। তাদের পড়াবার জন্যে মিহিরকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল রমলা;

মিহির যথারীতি পড়ালো। কিন্তু একটা প্রশ্ন তার মনে আজ জাগছে, রমলা কি জন্যে তাকে এত প্রশ্ন করলো, নিজের হাতে চা-খাবার নিয়ে এলো? সে যে-ধরনের মেয়ে তাতে অকারণে কোনো কথা শুধোবে না, নিশ্চয়ই কোনো গূঢ়তর কারণ আছে। হয়তো তার সম্বন্ধে কোনও কথা, কিংবা কোনো বিরুদ্ধ মন্তব্য শুনেছে। কিন্তু বিরুদ্ধ মন্তব্য শুনে থাকলে রমলা নিশ্চয়ই অমন স্নেহসজল কণ্ঠে প্রশ্ন করত না—হয়তো দেখাই করত না।

সামান্য গৃহশিক্ষক মিহির। তাকে ছাড়িয়ে দিতে রমলার এক মিনিটও সময় লাগবার কথা নয়। তাহলে কি কারণ? ভেবে কুলকিনারা পেল না মিহির।

কয়েকদিন কেটে গেল। গান আর এর মধ্যে শুনতে পায়নি মিহির। ভেবেছে ও গান নিশ্চয় অন্য কোনো বাড়ি থেকে আসছিল। অথবা এই বাড়িতেই এদের কোনো আত্মীয়া এসে থাকবে। হয়তো ওই সুধাকণ্ঠ তারই।

ওপরের ঘরে কোনোদিন যায়নি মিহির। মিনি এবং হিরণ নীচের তলায় এসে তার কাছে পড়ে। মাঝে মাঝে রমলা দেখা করে। কথাও বলে, আবার যথারীতি চা-খাবারও খাওয়ায় মিহিরকে।

বিমলের সঙ্গে মিহিরের কদাচিৎ দেখা হয়। কারণ, বিমল এই সময় থাকে অফিসে। রবিবার বিমল বাড়িতে থাকলেও সেদিন ও পড়াতে আসে না।

সেদিন হঠাৎ মিহিরের টাকার দরকার হওয়ায়, বিকেলে গেল বিমলের বাড়ি, মাইনেটা চাইবে। দেখল গৃহস্বামী রয়েছে। ওকে বসিয়ে বিমল বললো,—মেয়েটার এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। ভালো করে যেন পড়ানো হয়। তোমাকে এর জন্যে আরও বেশি বেতন দেওয়া হবে।

—আজ্ঞে, পরীক্ষার দেরি আছে এখনও। মিনি যাতে ভালোভাবে পাশ করতে পারে তার জন্যে কিছু ক্রুটি করব না।

চা-খাবার খেয়ে, টাকা নিয়ে বেরুবে মিহির, এমন সময় হঠাৎ সেই অপূর্ব মিষ্টি গলার গান শুনতে পেল।

কে গাইছে, কোথায় গাইছে, জিজ্ঞাসা করতে পারলো না মিহির বিমলকে লজ্জায়। তাই শুধুলো,

—মিনি আর হিরণ কোথায়? তাদের দেখছি না তো!

—ছুটির দিন ওরা ওদের দিদির কাছে গান শেখে। তারা ওপড়ে আছে।

—ও! বলে, মিহির যথারীতি নমস্কার করে চলে এলো।

—সেইদিনই মিহির জানলো, এই গান তাহলে সেই দিদির গলার!

পরদিন যথাসময়ে পড়াতে এলো মিহির। ছাত্র-ছাত্রীও যথা নিয়মে পাঠ শুরু করে দিল। পড়াতে পড়াতে মিহির তাদের শুধুলো,

—গান কেমন শিখছ মিনি?

—শিখছি, তবে দিদির মতো নয়! কি মিষ্টি গলা দিদির, যেন কিন্নরী। গানের উপযোগী মিষ্টি গলা মিনির। সে তাই বাজনা শেখে। গীটার বাজাতে শিখছে সে।

—তোমার দিদি কি করেন? নীচে নামেন না কেন?

মিহির মিনিকে প্রশ্ন করলো, হিরণ আগে তার বদলে জানিয়ে দিল,

—জানেন স্যার, দিদি আমাদের জুয়েল। এম-এ পাশ ইংরেজীতে। ছোটদির সব খাতাপত্র দিদিই তো দেখে দেয়। তাই ওর ভুলচুক আপনি ধরতে পারেন না। দিদি সব ঠিক করে দেয়! আসলে দিদির বুদ্ধিটা নিয়ে ছোটদি আপনার কাছে মেধাবী ছাত্রী। ওর মেধা না কচু।

—হিরণ, ভালো হবে না বলছি। ভাইকে ধমক দিল মিনি।

এ রকম খুনসুটি ওদের প্রায়ই হয়। তাই মিহির বললো,

—তোমার খাতাও তো দেখে দেন তিনি?

—হ্যাঁ। দিদির কাছে আমরা সবাই সমান। দিদি তো আমাদের কাছে দেবী।

—দেবী!

—হ্যাঁ স্যার, দেবী। দেখলে আপনি বুঝতেই পারবেন না দিদি মানুষ।

—হবেও তাই। আমি তো তাঁকে দেখলাম না কোনোদিন।

—দেখবেন কি করে? দিদি তো নীচে নামতে পারেনা। তার ডান হাত, ডান পা অবশ। সব কাজ বাঁ-হাতে করে। ছাদের ঘরেই সব সময় থাকে দিদি। গান গায় আর পড়ে। পড়ে আর গান গায়।

—কৈ, গানও তো তেমন শোনা যায় না। ক্বচিৎ কখনও শুনেছি।

—শুনবেন কি করে? অনেক রাতে দিদি গান গায়। তখন তো আপনি থাকেন না।

—এতদিন তো তোমরা তার কথা কেউ বলনি আমায়?

—না, মা মানা করেন। বলেন, তোর দিদি আর মানুষ নেই, দেবী হয়ে গেছে। ওর কথা কাউকে বলিস না। মাও বলে না কাউকে।

ব্যাপারটা যে ঠিক কি, বুঝতে পারলো না মিহির। সে আশ্চর্য হলো কিন্তু তবে তার বলবার কিছু নেই। সে শুধু বুঝলো, মিনি আর হিরণের একজন দিদি আছেন ওপরে, তার ডান-অঙ্গ অবশ, অথচ তিনি বিদুষী এবং সঙ্গীতজ্ঞা। তাঁর খবর এতদিনেও জানা যায়নি।

যাঁর গলা এমন মিষ্টি, না জানি তিনি দেখতে কেমন! তিনি কি করেন সারা দিনরাত? কেমন করে কাটে তাঁর দিন রজনী?

নানা কথা ভাবতে লাগলো মিহির ওই না-দেখা মেয়েটির সম্বন্ধে। কিন্তু

মিনি আর হিরণের কথাতেই বুঝলো, এ বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন রমলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করা চলে না। তিনি কিছু বলতে ইচ্ছুকও নন।

মিহির সামান্য গৃহশিক্ষক। তার দরকার কি অতসব পারিবারিক খবরে? কিছুই সে শুধলো না। শুধু ওই না-দেখা মেয়েটির দুর্ভাগ্যের জন্যে সে যেন খুবই দুঃখিত হলো।

চিন্ময়ী থাকে তেতলার ছাদের সংলগ্ন সেই ঘরে। দিন কাটে তার তেমনি ভাবে। বয়স তার কুড়ি পেরিয়ে গেছে। সে জানে, এ বাড়ি তার বাপের বাড়ি নয় এবং রমলা তার মা নয়, আর বিমলও তার বাবা নয়।

এ কথাটা তাকে জানাতে চায়নি বিমল, কিন্তু রমলা একদিন ঝগড়ার সময় বলে ফেললো। কান খাড়া করা ছিল চিনির। সে শুনলো তার মা রমলা তাঁর কেউ নয়, বিমলও কেউ নয় তার।

নিজের মা-বাপ বলে যাদের এতদিন জেনে এসেছে, সেদিন হঠাৎ যখন জানলো, তারা তার কেউ নয়, তখন তার মনের অবস্থা কি হয়েছিল তা অনুভব করা ছাড়া বোঝানো যাবে না কোনো ভাষা দিয়ে।

শুধু এটুকু বলা যায় যে, সেদিন চিনির চোখ ফেটে জল এসেছিল! আর সে-জল সারাদিন শুকোয়নি।

তবে চিনি খুবই শান্ত স্বভাবের, ধীরে ধীরে সামলে উঠলো।

সেই পুরাতন ইতিহাস এই ঃ

ষোল বছর বয়স তখন চিনির। স্কুল ফাইন্যাল দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। একজন বাড়তি গৃহশিক্ষক তাই রাখতে চেয়েছিল বিমল। রমলা আপত্তি করে বলেছিল,

—পরের মেয়ের জন্যে অত আদিখ্যেতা কিসের?

ওপরের ঘরে বসেই শুনতে পেল চিনি মা-বাবার কথা। কথা তো নয় ঝগড়া।

শুনতে পেল বিমল বলছে,

—পরের মেয়েকে নিয়েই তো ঘরে মেয়ে পেয়েছ। ওকে অত হেনস্তা করা কি উচিত?

—হেনস্তা কিসের! রাজকন্যার মতোই তো আছে। তুমি কি বলতে

চাও, ওই চিররুগ্না মেয়েটাকে কোলে নিয়ে আমায় বসে থাকতে হবে?

—না, না সেসব কিছু করতে হবে না। ওকে আর একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দিই, নিজের পায়ে ও দাঁড়িয়ে যাবে।

—পা-ই নেই তার, তো পায়ে দাঁড়াবে। অনর্থক মাসে মাসে শ'খানেক টাকা বরবাদ! বলেই চলে গেল রমলা।

বিমল এল চিনির কাছে। পড়ার টেবিলেই বসে আছে চিনি। কথাগুলো সবই শুনেছে সে। কিন্তু সে যে কিছু শুনেছে তা জানাতে চায় না, যদিও সব কিছু জানবার জন্যে মন-প্রাণ তার ব্যাকুল হয়েছে। তবু চিনি দমন করলো আগ্রহ!

চিনির কাছে এসেই কিন্তু বিমল বুঝলো, ও তাদের কথা শুনেছে। মুখে তার আকুল আগ্রহ, অন্তরে অন্তরে ব্যথা, চোখে অসহায় চাউনি।

বিমল বুঝলো, ওর মনে ঝড় উঠেছে। এ পর্যন্ত সে জানে, তার স্নেহশীল বাবা এবং মা-বাপ। আজ এতখানি বয়সে যে যদি জানে এরা তার কেউ নয় তাহলে চিন্তাশীল মন কেমন হবে, অনুমান করা দুঃসাধ্য।

বিমল ব্যথিত হলো, কিন্তু নিরুপায়। শুধু বললো,

—কিছু ভাবিসনে মা। আমি তোর টিউটর রেখে দেবো।

—হুঁ! এ ভিন্ন, চিনি আর কিছু বলেনি সেদিন!

চিনির জন্যে টিউটর এলেন একজন মহিলা। রমলার অবশ্য খুবই রাগ সেজন্যে। কিন্তু বিমল কোনো কথা শুনলো না, মাসিক একশ' টাকা বেতনে সেই মহিলাকে নিযুক্ত করলো। ওঁকে জানাল, চিনি ভালোভাবে পাশ করলে বিমল তাঁকে পাঁচশ' টাকা পুরস্কার দেবে।

মহিলাটি শিক্ষয়িত্রী! সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা ও বধূ—সন্তানের জননী। তিনি অতি যত্নে চিনিকে পড়াতে লাগলেন। আসেন বিকেল পাঁচটার পর-দু-তিনঘণ্টা থাকেন এবং সব বিষয়ই পড়ান।

চিনি ছাত্রী ভালো। তাই ভালোই পড়তে লাগলো এবং যথাকালে 'ইনভ্যালিড' গাড়িতে চড়ে পরীক্ষা দিল—পাশও করলো ভালোভাবে।

খুব হয়েছে, এবার থামো। আর ওকে পড়াতে হবে না তোমায়।

—পড়াতে ওকে হবেই রমলা। আর কোনও কাজ করবার সুযোগ যখন ওর নেই।

—এত পড়িয়ে কি হবে? বিয়ে তো আর হবে না ওর!

—তার জন্যেই তো পড়াতে হবে। পড়াশুনা নিয়ে কাটাবে জীবনটা।

—মাসিক খরচ কত হবে ওর পেছনে হিসেব করেছ।

—করেছি। খরচ আমি করবো। বিমল বেশ গম্ভীরভাবে বলল—আশা করি তুমি বাধা দেবে না।

রমলা আর কিছু বলতে সাহস করলো না। কিন্তু মনে মনে রাগে ফুলতে লাগল।

ওদিকে গানের মাস্টারও আসছে। তার জন্যও গোটা পঞ্চাশ টাকা লাগে।

আয় অবশ্য আছে বিমলের। বড় ব্যবসা—মোটা আয়; কিন্তু রমলারও তো দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে। তাদেরও তো ভবিষ্যৎ আছে। ওই পরের মেয়ের জন্য এত কেন? তাছাড়া কি-বা কাজে লাগবে তাকে এত পড়িয়ে?

এত কথার কোনোটাই কিন্তু বলা হল না বিমলকে। সে অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ—চিনিকে সে নিজের সন্তানের থেকেও বেশি ভালোবাসে? বেশি কিছু বলতে গেলে হয়তো আরো বেশি কিছু খরচ করে বসবে চিনির জন্যে।

একেই তো বলে, 'ওকে চিকিৎসার জন্যে বিলেত পাঠাব। ওর জন্যে একখানা বাড়ি করে দেবো। ওকে দু'লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনে দেবো' ইত্যাদি।

যাকগে। আর বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। এইসব ভেবে রমলা চুপ করে রইল।

চিনি পড়ছে। এখন পড়াচ্ছেন একজন প্রফেসর। বিমল প্রতিদিন অফিস ফেরত ওর গাড়ি থেকে নেমেই সটান চলে যায় ওপরে চিনিকে দেখতে। কিছু-না-কিছু নিয়েও আসে তার জন্যে। হয়তো বই, নয়তো ফল-মিষ্টি, অথবা শাড়ি একখানা। কিছু না পেলে অন্তত একগুচ্ছ ফুলও নিয়ে আসে। খালি হাতে কোনোদিন আসে না বিমল। রমলা দেখে, দেখে রাগে গজগজ করে।

রমলার নিজের ছেলেমেয়েও বড় হচ্ছে। তাদের জন্যে তো এতটা স্নেহ-মমতা দেখা যায় না বিমলের। কথাটা রমলা একদিন বলেই ফেললো।

—পরের মেয়ের চিন্তায় তো ঘুম ধরে না, অথচ নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে তুমি নির্বিকার।

—ওদের জন্যে তো তুমি আছ। বাড়ির সব ঝি-চাকর, আর ওদের

খেলার সঙ্গী-সাথী পাড়ার সব আছে! চিনির জন্যে একমাত্র আকাশের ঈশ্বর আর আমি ছাড়া কেউ নেই। তাই দেখতে হয় তাকে।

—ও! আমি বুঝি তার জন্যে কিছুই করিনি?

—কর, নিশ্চয় কর! যতখানি হেনস্তা করবার, কর। কিন্তু রমলা! আমি ওকে যেদিন এনেছিলাম, সেদিন তুমিই সর্বাগ্রে ওকে নিয়েছিলে বুকে তুলে।

—হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। এখনও তো ফেলে দিইনি। ভালো চিররুগ্ন কাউকে নিয়ে দিন কাটানো কি কঠিন, তুমি বুঝবে? তুমি তো সকাল-বিকেল অফিস নিয়েই থাক, যত ঝামেলা আমাকেই পোহাতে হয়।

—ঝামেলা! না রমলা, ওর কোনও ঝামেলা নেই। একথা আমি বিশ্বাস করিনে। খেতে না দাও ও শুকিয়ে মরে যাবে, তবু তোমাকে কিছু বলবে না। চিররুগ্ন হওয়ার জন্যে ও নিজে দায়ী নয়।

—দায়ীর কথা বলছিনে বলছি, ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, তারা দেখে তোমার অতিরিক্ত স্নেহ-মমতা চিনির ওপর। এটা ওদের ভালো লাগে না।

—এ কথাও সত্যি নয়। মিনি আর হিরণ দিদির জন্যে কি না করে! দিদিকে তারা এত ভালোবাসে যে দু-ঘণ্টা দিদির কাছে না গেলে তারা কাঁদে। এ প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি। আর আমি যখন অফিস থেকে এসে ছাদে যাই চিনিকে দেখতে, তখন তোমার হিরণ-মিনিও সেখানেই বসে থাকে। তাদেরও কম স্নেহ করিনে আমি। তবে চিনির জন্যে একটু বেশি কিছু আনতে হয়। ছেলেমেয়ে বড় হলে তাদের জন্যেও আনব। এ নিয়ে হিংসা করো না রমলা! চিনি বড় দুঃখী। অভাগীর জীবন কেমন করে কাটাবে ভেবে রাত্রে আমার সত্যি ঘুম হয় না।

রমলা বুঝলো, আর বেশি কথা বাড়ালে ব্যাপারটা খারাপ হবে। তবু সে বললো,

—হিংসে কেন করতে যাব? তবে ও যখন আর সারবেই না, তখন আর বাড়িতে রাখা কেন? কোন ইন্‌ভ্যালিডদের আশ্রমে রেখে এসোগে।

—চেষ্টা করছি, দেখি যদি কোথাও পাই।

বলে, বিমল চলে গিয়েছিল।

এরপর রমলা কোনো কথা বলতে সাহস করেনি। তার ছেলেমেয়েরা বড্ড সেয়ানা। সব অবসর সময়টা তারা প্রায় ছাদে চলে যায় দিদির কাছে।

দিদি, দিদি আর দিদি। কিছু একটু ভালো খাবার দাও মিনিকে, অমনি বলবে, দিদিকে দিয়েছ মা? কোনও একটা খেলনা পেলে তৎক্ষণাৎ ছুটবে দিদিকে দেখাতে। দিদি যেন জীবন ওদের।

উপায় নেই রমলা এর কোনো প্রতিকার করতে পারে না—পারবেও না।

মিনি আর হিরণ তাদের মায়ের সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও চিনির কাছে যাবে, কোনো কথাই শুনবে না। নাজেহাল হয়ে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে এখন রমলা।

মাস্টার রাখা হয়েছে মিনি-হিরণের। খুব ভালো মাস্টার। দেখতে সুন্দর—স্বাস্থ্যবান। ভালো স্কলার—এসব শুনেছে রমলা মিহিরের সম্বন্ধে। তাই মিহিরের প্রতি তার স্নেহাধিক্য।

চা-জলখাবার প্রায়ই খাওয়ায় মাস্টারকে রমলা। সেদিনও খাওয়ালো।

মিনি-হিরণ ছিল না, গেছে রথের মেলা দেখতে। ফিরে এসে পড়বে। তাই বসে আছে মিহির।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরলো মিনি-হিরণ। কিন্তু এসেই চলে গেল ওপরে। যেতে যেতে বললো,

—দিদিকে সব দেখিয়ে আসি স্যার, বসুন।

হিরণের হাতে খেলনা। মিনির হাতেএকটা সৌখীন পুতুল, আর পেছনে চাকরের মাথায় কতকগুলো গাছ, যা ওপরের ছাদের টবের জন্যে আনা হয়েছে।

ওরা চলে গেল। মিহির ভাবতে লাগল, কে এই দিদি? কেমন এই দিদি? সেই দিদিকে দেখার কি তার কোনও উপায় নেই?

অনেকক্ষণ পরে হিরণ আর মিনি ফিরে এসে পড়তে বসল।

নিজের সন্তানের ওপর দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর রমলার। তাদের শরীর, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সে সদা সজাগ। তাদের আরাম, বিরামের জন্যে কোনও ত্রুটি হতে দেয় না রমলা। পড়াশোনার দিকেও নজর আছে, তবে সেখানে খানিকটা ঈশ্বরের হাত, অথবা প্রকৃতির। হাত যারই বলা হোক, প্রতিভা সকলের সমান হয় না; অকর্মণ্য চিনি যে ভাবে পর পর ক্লাশ ডিঙিয়ে পাশ করে

উচ্চশিক্ষা লাভ করলো, মিনি বা হিরণ তা করতে পারছে না, এর জন্যে কার কাছে নালিশ করবে রমলা?

চিনির মতো বুদ্ধি তাদের নয়, তবু তারা পড়ছে এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মতো পাশও করে চলেছে। ভালো মাস্টার দিলে হয়তো ফল আরো ভালো হবে, তাই মিহিরকে আনা হয়েছে।

ওপরে থাকে চিনি। মিহির নীচে একটা ঘরে মিনি আর হিরণকে পড়ায়। চিনির সঙ্গে মিহিরের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং রমলা চায় না যে দেখা হোক। কেন চায় না তার কারণটা বোঝা কঠিন নয়। তবে তার সে গোপন কথা এখন গোপনই থাক, যথাকালে জানা যাবে।

বিমল কিছুটা বুঝেও, না-বোঝার ভান করে, অর্থাৎ বিশেষ আমল দেয় না। বাকি সব ভ়ালোই চলছে!

মিনি এবার স্কুল ফাইন্যাল দেবে। পরীক্ষার আর দেরি নেই, তাই মিহির বললো একদিন রমলাকে,

—সকালে ঘণ্টাখানেক আমি এসে পড়িয়ে যাব।

—ভালো, খুব ভালো কথা। পরীক্ষা কবে?

—আরো মাস দুই দেরি আছে। তবে এখন থেকেই একটু দেখতে হবে।

—আসবে। সকালের চা-জলখাবার এখানেই খাবে তুমি।

—আচ্ছা।

মিহির পরদিন থেকে সকাল সাতটায় এসে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়টুকু পড়াতে লাগলো মিনিকে। আবার সন্ধ্যার সময়ও যথারীতি আসে। সকালে যে অঙ্ক বা ট্রানস্লেশন দিয়ে যায়, বিকেলে এসে সেগুলো দেখে। আজও এসে বললো,

—কৈ, ট্রানস্লেশন দেখি।

মিনি খাতা বের করে দিল। পাতা উল্টে মিহির দেখতে পেল, সুন্দর হস্তাক্ষরে লাল কালিতে কয়েকটা জায়গা সংশোধন করা হয়েছে।

—কে এই সংশোধন করেছে? মিহির প্রশ্ন করলো।

—দিদি। উত্তর দিল মিনি।

—ও আচ্ছা। তাহলে এটা থাক এখন। অন্য বই আন।

কি বই আনব? ইতিহাস?

—হুঁ।

মিনি ইতিহাস পড়তে লাগলো। মিহির সংশোধন করা খাতাটা দেখছে। কি সুন্দর হস্তাক্ষর। আর সংশোধন য়্যা করেছে চমৎকার।

এই দিদিকে দেখবার জন্যে, জানবার জন্যে আগ্রহ তার অতিরিক্ত হয়ে উঠলেও স্বাভাবিক সংস্কার আর শালীনতার জন্যে সে কোনো প্রশ্নই কাউকে করতে পারল না। অথচ মন তার সব সময় জানতে চায়, কে এই অন্তরালবর্তিনী মেয়েটি? কেমন সে? কেন তাকে কোনো সময়ই প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না। সবই যেন তার কাছে রহস্যময়।

অবশ্য মিহির শুনেছে মেয়েটি অসুস্থ। ওপরেই থাকে, নীচে সে নামতে পারে না। কিন্তু নীচে যে একেবারেই নামে না তা তো নয়। নামালেই নামে। অর্থাৎ তাকে ধরে নামিয়ে আনতে হয়।

এমন কি গুরুতর অসুখ কে জানে? তবে মিহির সুযোগ পেলে একবার দেখতে চায় তাকে।

নিশ্চয় সুযোগ হয়ে যাবে কোনো একদিন, এই আশায় আছে মিহির।

এদিকে মিনির পরীক্ষা আসছে। সেটা শেষ হলে হয়তো মিহিরকে আর দরকার হবে না। তবে হিরণ এখনও আছে। তার জন্যে মাস্টার দরকার। হয়তো মিহিরকে আরো কিছুদিন থাকতে হবে হিরণের জন্যে। তবে কোনো নিশ্চয়তা নেই।

পরীক্ষার জন্যে একটু বেশি সময় পড়ানো দরকার, এই অছিলায় মিহির দু'বেলা যাচ্ছে পড়াতে। তার একান্ত আশা যদি কোনো রকমে ওপর তলার সেই না-দেখা মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়।

ওপরের ঘরে তো অনুমতি ছাড়া ওঠা যায় না। অনুমতিই বা চাওয়া যায় কি করে? কিন্তু মিহিরের মনে এক অদম্য পিপাসা জাগতে লাগলো সেই না-দেখাকে দেখার জন্যে —না-জানাকে জানার জন্যে। এ যেন একটা বিচিত্র বিস্ময়কর তাগিদ ওর মনের। বহু সময় সে নিজেকে বোঝাতে চায়, এটা অন্যায় চিন্তা—অনুচিত চিন্তা। অকারণ ক্ষোভ তার। কোনই কারণ নেই, যার জন্যে মিহির এত উতলা হবে। শুধু ওর গান শুনেছে, আর জেনেছে সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী—বিদূষী, কিন্তু পঙ্গু।

'পঙ্গু' কতখানি তা অবশ্য ভালো করে জানার সুযোগ পায়নি মিহির। শুধু

জেনেছে, মেয়েটির ডান-অঙ্গ অবশ। যা কিছু করে বাঁ-হাত দিয়ে। ডান হাত এবং ডান-পা দিয়ে কিছু সে করতে পারে না। এর কারণ নাকি ছোট বেলায় তার এমন অসুখ হয়েছিল, যার জন্যে তাকে প্রায় বছর খানেকের বেশি বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। অসুখ অবশ্য ভালো হয়েছে, কিন্তু ডান-অঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। এর বেশি আর কিছু বলতে পারেনি মিনি তাকে।

সহানুভূতি আকর্ষণের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। চিনির এই দুর্ভাগ্যকে আরো অনেক বেশি কল্পনা দিয়ে মিহির নিজের মনে মনে গড়ে তুলেছে একটি ছবি—অতি দুর্ভাগা একটি তরুণী মূর্তি—করুণ-কোমল।

এতখানি সহানুভূতি আসবার কথা নয়, তবু এসে গেল কয়েকটা কারণেই। মিনি আর হিরণের কাছে শুনেছে তার প্রশংসা। দেখতো ওর ওপর গৃহকর্ত্রীর বিরূপ মনোভাব। আরও লক্ষ্য করেছে মিহির, ওই না-দেখা মেয়েটি একটি আশ্চর্য প্রতিভা যেন! রূপ তার যাই হোক, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে সে অনন্যা।

সুযোগ কোনোদিন হয়তো হয়ে যেতে পারে মিহিরের ওই মেয়েটিকে দেখবার। এই আশায় সে অপেক্ষা করে।

মিনির পরীক্ষা চলছে এখন। ওটা শেষ হলেই হয়তো মিহিরকে জবাব দেওয়া হবে, এই কথা ভাবছে সে।

পরীক্ষা শেষ হলো! রমলা সেদিন মিহিরকে নিমন্ত্রণ করেছে মাত্র, খাওয়াবে। ভাবছে, ও বাড়িতে আজই তার শেষ দিন। কিন্তু না, রাত্রে রমলা পরম যত্নে তাকে খাইয়ে বললো,

—হিরণ তো পড়বে। তোমাকে আরো অনেকদিন থাকতে হবে এখানে! ওছাড়া মিনিকে আরো পড়ানো হবে। ওর বাবার ইচ্ছে, তুমি যেমন আছো, থাকো।

—যে আজ্ঞে। মিহির খুশী হয়ে বললো,

হিরণকে পড়াতে হবে! তাছাড়া মিনি যদি আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায় তো মিহিরই এখন তাকে পড়াবে। অতএব আরও বছর দুই অন্তত থাকা যাবে এ বাড়িতে। থাকার আর অন্য কোনো কারণ নেই, শুধু ওই না-দেখা মেয়েটিকে দেখার ইচ্ছে ছাড়া। কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য, কোনোদিন তাকে দেখতে পেল না মিহির।

পড়াতে যাচ্ছে হিরণকে। মিনি এখন আর পড়ছে না। তার পরীক্ষার ফল

এখনও বের হয়নি। তবে মিনি আসে, এসে বসে মিহিরের কাছে। বিকেলে বেশ সাজ-সজ্জা করেই আসে মিনি পড়ার ঘরে।

উন্নত যৌবন এখন সে। বয়স ষোল ছাড়িয়েছে—সুন্দরী এবং সুমার্জিত। মিহিরের হাতে গড়া মিনি। প্রায় চার বছর মাস্টারি করছে মিহির এ বাড়িতে। এখন বাড়ির লোকের মতো হয়ে গেছে সে। সুতরাং মিনি পড়ার ঘরে এখনও আসে, নানারকম প্রশ্ন করে, এটা যেন তার অধিকার।

সেদিন মিনি সিনেমায় যাবার প্রস্তাব করলো মিহিরের কাছে। কি একটা কাজে আসছিল সেই ঘরের দিকে রমলা। বললো,

—যাও মিহির। ওর সঙ্গী নেই—যাও একটু ঘুরিয়ে আনগে।

সিনেমা অবশ্য অনেকদিনই যায় মিনি। মিহিরকে কোনোদিন ডাকেনি। আজ হঠাৎ আমন্ত্রিত হয়ে মিহিরকে যেতে হলো। এর আগে মিনি যেতো তার স্কুলের সঙ্গীদের সঙ্গে—আজ যাবে মিহিরের সঙ্গে একা।

এর কোনো কারণ আছে, এমন সন্দেহ জাগেনি মিহিরের মনে। তার ধারণা, সাধারণ মেয়েরা যেমন যায়, মিনিও তেমনি যেতে চায়। অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকার কোন হদিশ সে পায়নি। এদিক দিয়ে মিহির হয়তো কিছু আহাম্মক শ্রেণীর যুবক। বিদ্যা এবং বুদ্ধি তার যথেষ্ট আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কূটবুদ্ধির একান্ত অভাব আছে। কোন মানুষ কি জন্যে কেমন ব্যবহার করে, জানবার চেষ্টাই সে করে না। আজও করলো না। সিনেমায় গেল।

সুন্দরী হয়ে উঠেছে মিনি এই ক' বছরে। যৌবনান্বিতা তরুণীর লাবণ্য তো আছেই, অধিকিন্তু আছে আধুনিক রূপসজ্জা। আর আছে বর্তমান যুগের সুনিবিড় চাটুল্য।

সব মিলিয়ে মিনি মনোহারিণী হয়ে উঠেছে। নৃত্যের ভঙ্গিতে চলে ফেরে। তাকে ভ্রমণ-সঙ্গিনী পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। তাই মিহিরও এই সৌভাগ্যকে সানন্দে বরণ করে নিল।

সিনেমা-ঘরের সীটে বসে ছবি দেখার বিরতির মধ্যে মিনি হঠাৎ বলে বসলো,

—দিদির কাছে গল্পটা শুনেছিলাম, নইলে কিছুতেই বুঝতে পারতাম না।

—তোমার দিদি কতটা পড়েছেন? জানা থাকলেও তবু শুধুলো মিহির।

—কতটা? ওরে বাবা! দিদি একেবারে বিদ্যের দিগ্‌গজ—এম-এ পাশ। এখন ডক্টরেট হবার জন্যে নাকি থিসিস্ লিখছে।

—গান-বাজনাও জানেন তো?

—হ্যাঁ। তবে ওস্তাদ কিছু না। গলা ভালো, তাই বাবা গান শিখিয়েছেন। আমি সুযোগমতো একদিন নিয়ে যাব আপনাকে গান শোনাতে ওপরে।

—ওপরে! তেতলায়?

—হ্যাঁ। দিদি তো নীচে নামতে পারে না। লিফ্‌ট নেই—আপনাকেই যেতে হবে।

—কোনোদিনই নামতে পারেন না নীচে?

—কোলে তুলে, না হয় স্ট্রেচারে তুলে নামাতে হয়। পরীক্ষার সময় বাবা সেইভাবেই দিদিকে নিয়ে যেতেন। তবে সে অনেক হাঙ্গামা।

—ওপরেই নাওয়া-খাওয়া করেন?

—হ্যাঁ। দিদির জন্যে সব আলাদা ব্যবস্থা আছে।

মিহির আর কিছু শুধোবার পেল না, যদিও অনেক কিছুই তার জানবার আছে। অনেকক্ষণ তার মনের মধ্যে ওই না-দেখা মেয়েটির কথাই জাগতে লাগলো।

মিনি নিশ্চয়ই একদিন মিহিরকে গান শোনাবার জন্যে ওপরে নিয়ে যাবে। সেই আশায় আশায় অপেক্ষা করে থাকবে সে। সিনেমা শেষ হলে মিহির আবার বললো

—এতখানি লেখাপড়া শিখেও তিনি ওপরেই বসে থাকেন?

—হ্যাঁ, কি আর করবে? বাবা ওর জন্যে একটা চাকরির চেষ্টা করছেন?

—চাকরি? কি করে চাকরি করবেন উনি?

—শিক্ষকতার কথাই ভাবছেন বাবা। আর দিদিরও তাই মত।

—তোমার মা'র কি মত?

—মা'র কোন মতামত নেই। মা ওর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

—সে কি? কেন?

—দিদি তো মা'র মেয়ে নয়, পালিত কন্যা। ওর মা নেই, আমার মা মানুষ করেছে।

—ও! দিদি তাহলে তোমার সহোদরা নন?

—সহোদরা না হলেও তাকে সহোদরা বলেই মনে করি।

উত্তরটা শুনলো মিহির, কিন্তু খুশী হতে পারল না। এই ক'বছরে সে একদিন জানতে পারেনি যে, ওপরের ঘরের সেই পঙ্গু-মেয়েটি তার ছাত্র-ছাত্রীর সহোদরা নয়। আজ জানার পর মিহিরের মনের গোপন কোণে যে আগ্রহ ছিল তাকে দেখবার পর সেটা একমুহূর্তে যেন সহানুভূতিতে শতগুণ হয়ে উঠলো।

মিনি বলেছে, একদিন মিহিরকে নিয়ে যাবে ওপরে তার দিদির কাছে। সেই দিনটি শীঘ্রই আসার জন্যে কায়মনে কামনা করতে লাগলো মিহির।

পঙ্গু একটি তরুণীর জন্যে একজন যুবকের মন বা অন্তর অনুক্ষণ পুড়ছে, দুনিয়ার কার তাতে কি এসে যায়? মিনি হয়তো কথাটা ভুলেই গেছে। প্রায় মাসখানেক আর এ বিষয়ে কথা হয়নি মিনির সঙ্গে।

না, মিনি ভোলেনি। শুধু সুযোগের অপেক্ষা করছিল। সেদিন বললো,

—আপনাকে সেদিন দিদির গান শোনাব বলেছিলাম, আজ শোনাব।

—কখন?

—সন্ধ্যেবেলা সাতটার সময় আপনি আসবেন কিন্তু। অসুবিধে হবে না তো?

—না, অসুবিধে কেন হবে?

—আজ রবিবার, যদি কোথাও এনগেজমেণ্ট থাকে আপনার তাই বলছি!

—না, তেমন কিছু নেই। আমি নিশ্চয় আসব।

সাতটার সময় মিহির এলো। মিনি তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মিহির আসামাত্র তাকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে গেল। মিহিরের বুকটা কেমন যেন করছিল ওই না-দেখা মেয়েটিকে দেখবার পূর্বে। ছাদের ওপর উঠে সে দেখলো, টবে-টবে ফুলগাছ সাজানো। প্রত্যেকটি গাছ সযত্নে লালিত—ফুলে-ফুলে ভরা। একধারে একটা জাল-দেওয়া খাঁচায় কতকগুলো ছোট পাখী। একটা বড় কাঁচের জলাধারে রঙিন মাছও রয়েছে একপাশে। অনেক কিছুই রয়েছে সাজানো, যা দেখলে অনেকক্ষণ প্রাণভরে দেখা যাবে।

এখানে যিনি থাকেন, তাঁকে অতি যত্নে রাখার কোনও ত্রুটি নেই। খুব

ধনী লোকের মতোই থাকেন তিনি এবং অবস্থার তুলনায় যেন কিছু বেশি আরামেই বাস করেন।

—দিদি! বলে, মিনি মিষ্টি ডাক দিল।

—আয়! তৎক্ষণাৎ সাড়া এলো একটা লতাকুঞ্জ থেকে।

—নমস্কার।

কথাটা বললো মিহির। উত্তরে প্রতি-নমস্কার করলো চিনি। ভালো করে ওকে দেখা যাচ্ছে না লতার আড়ালে। তবু হাতদুটো কপালে তুললো চিনি। মিহির দেখলো, ডান হাতটাকে সে বাম হাতে ধরে নমস্কার জানাচ্ছে।

—নমস্কার।

শব্দটা শুনলো মিহির। আশ্চর্য মিষ্টি গলা। এই শব্দটাই জানিয়ে দিল যে, চিনির সবটাই মিষ্টি। দেখলো ওকে মিহির, ছোট একটা বেঞ্চে বসে আছে। ওকে না তুলে আনলে ও কোথাও যেতে পারবে না। কাছেই একটা চামড়া বাঁধানো মোড়া—মিহিরের বসবার জন্য।

—বসুন। অনুরোধ করলো চিনি।

মিহির বসতে বসতে বললো,

—আপনার কথাই শুধু শুনে আসছি এই চার বছর ধরে। চোখে আপনাকে আজ দেখলাম।

—আজ আমার সৌভাগ্য। আমিও আপনার কথাই কেবল শুনে আসছি।

—এ অসুখ আপনার কতদিন হয়েছে?

—বহুদিন। আমার বয়স তখন মাত্র-আট বছর, তখন আমার খুব অসুখ করেছিল, যাকে বলে বাত-ব্যধি। একটা অঙ্গ—মানে, ডান-অঙ্গ অবশ হয়ে যায় তাতে। আমার তাই হয়েছে।

—আজকাল নানা রকম ওষুধ-ইন্‌জেকশন ইত্যাদি বেরিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এ যুগে আর অঙ্গ অবশ্য বা ওরকম কিছু হয় না।

—কি জানি। কিন্তু আমার অসুখ বহুদিনের। এ কি আর ভালো হবে?

—ভালো রকম চিকিৎসা করালে আশা করি হয়তো ভালো হয়ে যাবেন।

চিনি চুপ করে রইলো।

মিনি ইতিমধ্যে একটা ট্রে-তে করে চা-খাবার আনলো—পরিবেশন করলো

মিহিরকে। চিনির কাছেও দিল চা-খাবার। চিনি ডান হাত নাড়তে পারে না, বাঁ-হাতে খাবে।

মিহির দেখলো, ওর এমন সুন্দর অভ্যাস হয়ে গেছে যে, ঠিকমতোই খেতে লাগল! মিনিও খাচ্ছে।

—হিরণ কোথায়? প্রশ্ন করলো চিনি।

...ও গেছে খেলা দেখতে।

—মা?

—মা তো বাপের বাড়ি গেছেন। আসবেন রাত্রে। বাবাও গেছেন। বাড়িতে এখন তুই আর আমি, আর মাস্টারমশাই।

চিনি আর কিছু শুধালো না। কিন্তু মিহির বুঝলো, মা'র অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই মিনি আজ মিহিরকে ডেকেছে চিনির সঙ্গে দেখা করাতে।

মানে তাহলে মা আছেন ব্যবধান।

উদ্দেশ্য কি হতে পারে, ভাববার এখন সময় নয়। তাই মিহির চিনির সঙ্গে কথা কইলো নানা বিষয়ে, জেনে নিল, কি ভাবে তার এই অসুখটা হয়েছে। ইতিহাসটা এই রকম ঃ শৈশবে তার টাইফয়েড হয়। দীর্ঘকাল তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। এক পাশে শুয়ে থেকে ডান পায়ে অসহ্য ব্যথা হতো। ডান-অঙ্গ নাড়তে পারতো না সে। খুব কষ্ট হতো। একদিন শুনতে পেল, ডাক্তার বলছেন বাবাকে—ওর ডান-অঙ্গ অবশ হয়ে আসছে। এর আর কোনো প্রতিবিধান নেই! ওকে ডানদিকটা নাড়তে নিষেধ করবেন।

—তারপর?

—শুনলাম আমি ডাক্তারের সব কথা। যদিও আমার বয়স খুব কম, তবু বুঝতে পারলাম, আমার ডান-অঙ্গ অবশ হয়ে যাবে। বাবা-মা সব সময় বলেন, ডান হাত, ডান পা নাড়াবে না। ওঁদের কথামতোই ডান-দিক নাড়াতাম না। এখন আর নাড়তে পারিনে। একেবারে অবশ হয়ে গেছে ডানদিকটা আমার।

—ডাক্তার কি বলেন?

—কি আর বলবেন! বলেন, ডানদিকটা আর সচল হবে না।

—কোনও স্পেশ্যালিস্টকে দেখানো দরকার।

—হুঁ! বলে, অল্প একটু থামলো চিনি। পরক্ষণে ও হতাশার সুরে বললো—আর ওসব করে কি হবে? আর ভালো হবে না।

—না হবার মতো আমি তো কিছু দেখছিনে।

—না, বাবা চেষ্টার কিছু ত্রুটি করেননি।

—আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

চুপ করে রইলো চিনি। মিনি চা-খাবার দিয়ে কোথায় গেছে। মিহির দেখলো, চিনির ডান হাতটা একটু যেন দুর্বল—শীর্ণ। কিন্তু ওই শীর্ণতা ছাড়া আর কোনো লক্ষণ দেখতে পেল না! ওর মনে হলো, অসুখটা হয়তো এখনও সারতে পারে। কিন্তু তার জন্যে যে ব্যবস্থা করা দরকার তা সে করে কেমন ক'রে।

বাড়ির কর্তা সম্পন্ন বাড়ি। টাকা-পয়সার অভাব তাঁর নেই। মিহির একবার তাকে বলে দেখবে, চিনিকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে পাঠাতে তিনি রাজী হবেন কিনা। যদি তিনি রাজী হন তো মিহির তার জন্যে ব্যবস্থা করবে বড় কোনো ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে।

চিনি যখন গাইছিল তখন মিহিরের মনে এই সব কথার আলোচনা চলছিল। সুতরাং সে তার গান ভালোভাবে শুনতেই পারলো না। গান শেষ হলে এক সময় বিদায় নমস্কার করে চলে এলো মিহির।

নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো তার মন। না দেখাই ভালো ছিল চিনিকে। দেখার পর থেকে মনের মধ্যে একটা দুর্জয় দুঃখানুভূতি ওকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কিন্তু কি সে করতে পারে? ওর বাবা-মা যা করবার করেছেন। মিহিরের কি করবার আছে? তবে সে জেনেছে, ওর বাবা-মা সত্যিকার বাবা-মা নন। চিনির ওর দরদ তাঁদের যতই থাক, আপন সন্তানের ওপর যে দরদ তা নিশ্চয়ই নেই। তবু তাঁরাই ওর অভিভাবক। এখানে মিহির কে? কী তার অধিকার? কীই-বা তার সম্বল?

চিন্তা করে কোনও ফল হবে না, জানে মিহির। তবু চিন্তাটা ছাড়তে পারছে না। অবশেষে ঠিক করলো, চিনির বাবার সঙ্গে সে কথা বলবে এবং চেষ্টা করবে চিকিৎসার জন্যে চিনিকে বিদেশে পাঠাবার।

উপায় একটা করবেই মিহির। চিনিকে সারাতে হবে। কিন্তু তারপর? তারপর যাই হোক, সে কথা এখন না বলাই ভালো। যদিও মনের অতল

তলে একটা দুরাশা তার জাগছে। কিন্তু কেন? এমন একটা অথর্ব, পঙ্গু মেয়ের জন্যে এতটা ব্যাকুল হবার কি দরকার! তার গার্জেনরা দেখাবেন। এ রকম ভাবলেও মিহির কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারলো না।

চিনির সঙ্গে বিশেষ কিছু কথা হয়নি মিহিরের। প্রথম আলাপ এবং পরিচয়ের কথাতেই যেটুকু সময় সে পেয়েছিল তাতেই বুঝেছে চিনির জীবন অত্যন্ত করুণ।

যে কোনো রকমেই হোক, চিনির জন্যে চেষ্টা করবে মিহির। চেষ্টা অর্থে ওকে ভালোভাবে ডাক্তার দেখার ব্যবস্থা। কিন্তু মিহির ভেবে দেখলো, চিনির পালক-পিতা চেষ্টা যথেষ্ট করেছেন। তার পালিক-মা'র এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই। এখানে কি করতে পারে সে?

পরদিন যথাসময়ে মিহির পড়াতে গেল ছাত্র হিরণকে। গিয়ে দেখলো, মিনির মা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। মিহির যেতেই তাকে বসিয়ে বললো,

—আজ মিনি আর হিরণকে নিয়ে একজিবিশন দেখিয়ে আনতে হবে।

—যে আজ্ঞে! কখন যেতে হবে?

—বিকেল চারটে নাগাদ হবে। ফিরে এসে তুমি এখানেই খাবে কিন্তু।

—আচ্ছা মা, মিনু কোথায়?

—আসছে। ততক্ষণ হিরণকে পড়াও।

হিরণ পড়ছে। রমলা চলে গেল। কিন্তু মিনি এখনও আসছে না। অবশ্য মিনির পরীক্ষা শেষ হয়েছে—পড়ার চাপ নেই। হয়তো মিনিকে ইচ্ছে করেই আসতে দেওয়া হয়নি। এই রকম কথা ভাবছে মিহির।

হিরণ একমনে বই পড়ছে। তার পাঠ্য-পুস্তকটা নিয়ে মিহির প্রশ্ন করলো,

—মিশর দেশ কোথায়? সেখানে কি বিখ্যাত?

—আফ্রিকায়! আর.....আর....

—আর নীলনদ! কথাটা বললো মিনি।

চেয়ে দেখলো মিহির ওর দিকে, সুন্দর সাজ তার অঙ্গে। এ পর্যন্ত এমন বেশে সে আসেনি কোনোদিন তার সামনে, তখনও দেখছে মিহির। মুখে একটু হাসিও লেগে রয়েছে মিনির। বললো,

—আজ যাচ্ছেন তো স্যার? কখন বেরুবেন?

—হ্যাঁ। চারটে নাগাদ বেরুলেই হবে। রাত দশটা অবধি তো একজিবিশন খোলা।

—অতখানি রাত অবধি মা থাকতে দেবে না। আটটার মধ্যেই ফিরতে হবে।

—বেশ তাই হবে। চারটের আগে কিন্তু একজিবিশন খোলে না।

—আমরা সাড়ে তিনটেয় বেরুবো।

—আচ্ছা! আমি তিনটের সময় আসব এখানে।

আরও কিছু কথার পর মিহির চলে এলো। সাড়ে তিনটে নাগাদ গেল আবার। হিরণ দশ মিনিটের মধ্যেই নেমে এলো। মিনির দেখা নেই, অবশেষে সে যখন এলো, ঘড়িতে তখন চারটে বেজে পাঁচ মিনিট। মিহির হাতঘড়িটা দেখিয়ে বললো,

—তোমারই দেরি হলো।

—তা হলো। চলুন।

প্রায় পাঁচ মিনিটের পথ ট্রাম লাইন। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। হিরণও আছে সঙ্গে। তবে সে যাচ্ছে আগে আগে। পথে মিহির মিনিকে বললো,

—তোমার দিদিকে জানিয়ে এলে?

—হ্যাঁ দিদিকে না বলে কিছু করিনে আমরা।

—তাঁকে একজিবিশন দেখানো যায় না?

—যায়। তবে ওকে লোক দিয়ে নামাতে হবে। তারপর গাড়ি করে নিয়ে যেতে হবে—তবে তো! সে অনেক হাঙ্গামা।

—হ্যাঁ, তা তো বটেই!

—আমি দিদিকে বলে এলাম একজিবিশনে যাচ্ছি। জানেন স্যার, দিদি এত ভালো মেয়ে যে কি বলব! দিদির মনে কোনও আশা বা আকাঙ্খা নেই, যেন কলের পুতুল। ওই গান আর পড়া, পড়া আর গান নিয়েই আছে দিদি।

—অসহায় অবস্থা ওঁর। কি আর করবেন

—হ্যাঁ, কিন্তু আমরা চাই দিদি নীচে আসুক।

—আসেন না?

—না, মা আসতে দেয়না।

কথাটি শুনে চুপ করে রইলো মিহির। মিনি বললো,

—দিদির মনে খুব দুঃখ, কেমন যেন নিরাসক্ত ভাব তার।

—হ্যাঁ, তা তো হবেই।

অনেকক্ষণ আর কেউ কোন কথা বললো না। কেমন যেন গুমোট ভাব। এ রকম অবস্থায় বেশিক্ষণ চলা যায় না। তাই মিহির বললো,

—এই ছবিটার খুব নাম-ডাক শুনেছি। আশা করি খুব ভালো হবে।

—হ্যাঁ। আমাদের পাশের বাড়ির রাঙা বৌদি দেখেছে। বলে, খুব ভালো।

—সবার রুচি তো সমান না। আমাদের ভালো না-ও লাগতে পারে।

—তবে রাঙা বৌদি ভালো সমঝদার—সমালোচকও বটে।

—বল কি! লেখেন সমালোচনা?

না, লেখে না, কিন্তু ওর যুক্তিগুলো বেশ অকাট্য।

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মিনি। তারপর কি যেন ভেবে শুধুলে,

—তোমার দিদির যুক্তিও খুব ভালো—অকাট্য।

—হ্যাঁ। কিন্তু দিদি তো সিনেমা দেখে না।

—সিনেমা কি কোনোদিন দেখেননি?

—কৈ, কে দেখাবে? আমরা শুধু গল্পটা বলি দিদিকে।

—গল্প শুনে কি সিনেমা দেখার সাধ মেটে?

মিহিরের গলার স্বর করুণ। চুপ করে গেল দুজনেই। কিছুক্ষণ কাটবার পর মিহিরই আবার বললো,

—ওঁকে কি আনা যায় না নীচে?

—যাবে না কেন? বললাম তো, স্ট্রেচারে করে নীচে আনতে হয়।

—তাই আনা যাবে। তারপর গাড়ি করে...

—মা অত ঝামেলা করতে দিতে চায় না।

—তোমার বাবাকে আমি বলব।

—তা, বলে দেখতে পারেন। তবে বাবাও বেশ ভয় করেন মাকে। মিহির আর কিছু বললো না। আপন মনে কি যেন ভাবতে লাগল।

পরদিন রবিবার! মিহির চেষ্টা করে মিনির বাবার সঙ্গে দেখা করলো। চেষ্টা অর্থে আর কিছু নয়, ভদ্রলোক নানান কাজে ঘোরেন, তাই বার তিনেক গিয়ে সে দেখা পেল তাঁর। নমস্কার করে বললো,

—আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে আমার।

—আচ্ছা, বল।

—আমি আপনার পালিতা-কন্যা চিনির বিষয়ে সবিশেষ জানতে চাই। ওঁর ওই অসুখ কবে থেকে, কি ভাবে হলো, তার কি ভাবে চিকিৎসা হয়েছে?

—চিনির অসুখ খুব ছোট বেলায়। ওকে সারাবার চেষ্টা আমি কম করিনি।

—হ্যাঁ, সে কথা শুনেছি। তবু আর একবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

—না মিহির, আর কিছু করবার নেই। এখন ওর জন্যে একটা ভালো কাজ, যা সে বসে বসে করতে পারে, খুঁজছি।

—আমার মনে হয়, ওকে আপনার বিলেত পাঠানো উচিত চিকিৎসার জন্যে।

—সে কথা আমিও ভেবেছি, হয়তো পাঠাতামও। কিন্তু ভেবে দেখ, একা তাকে পাঠানো যায় না। সঙ্গে আমায় নিজেকে যেতে হবে।

—যাবেন। নইলে ওর জীবনটাই যে নষ্ট হয়ে যায়।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার নিজের কথাটাও ভেবে দেখ। খরচ আছে, মিনি বড়ো হলে, বিয়ে দিতে হবে। যাওয়া মানে সব কাজ কারবার বন্ধ রাখা। এ সবই তো ভাবতে হয়।

মিহির আর কি বলবে? চুপ করে রইলো সে। অনেকক্ষণ পরে মিনির বাবাই বললেন,

—আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি মিহির। কি করা যায়, কি করা উচিত ঠিক করতে পারিনি। অবশেষে ঠিক করলাম, ওর খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা অন্তত করে দিতে হবে। গান-বাজনা শিখিয়েছি, লেখাপড়াও ভালো শিখেছে। আর আমি কি করতে পারি বল?

—আপনি যথেষ্ট করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে ওর জীবন পূর্ণ হবে না।

—না, নিশ্চয় না। আমি সে চেষ্টাও করব, ভেবেছি। তবে কোথায় পাব এমন উদার মহান ছেলে, ওকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করবে? ইন্‌ভ্যালিড মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। আর—

—আর কি বলুন।

—ওর পক্ষে বিয়ে না করাই ভালো, কারণ শারীরিক অক্ষমতা। ওকে

যদি কেউ টাকার লোভে বা আর কিছুর লোভে বিয়ে করে, তাহলে তার পরিণাম হবে ওর জীবন দুর্বহ...মারাত্মক।

—কেন?

—কারণ ওকে বিয়ে করে সে সুখী হতে পারবে না, হেনস্থা করবে—অসম্মান করবে। সে অবজ্ঞা ওর পক্ষে হবে মর্মান্তিক। দীর্ঘদিন ইনভ্যালিড সেবা করা যায় না—এমন কি মাইনে-করা নার্সেরও ক্লান্তি আসে। ও তো হবে বৌ।

কথাগুলো ভাববার মতো। মিহির নিঃশব্দে ভাবছে। মিনির মা এসে পড়লো। কাজেই মিহির বিদায় নিয়ে চলে এলো।

চিনিকে দেখার আগে থেকেই তার কথা ভাবতো মিহির। দেখার পর ভাবনা আরো বেড়েছে। এত বেশি বেড়েছে যে, অন্য কোনো চিন্তাই তার মাথায় আসে না এখন।

অনেক ভেবে-চিন্তে মিহির ঠিক করলো, সে চিনিকে বিয়ে করবার প্রস্তাবই করবে। সে আশা করে, তার পালক-পিতা এই প্রস্তাব নিশ্চয়ই মেনে নেবেন। অবশ্য চিনির মতো ইনভ্যালিড মেয়েকে নিয়ে সংসারে বাস করা যে কতটা বিড়ম্বনা হবে, সে-কথাও মিহির চিন্তা করলো।

আকাশ-পাতাল ভেবেও কিন্তু মিহির নিজের মনকে স্থির করতে পারলো না। চিনির প্রতি তার সকল ইন্দ্রিয়, মন-প্রাণ যেন ছুটে যেতে চাইছে। এই আশ্চর্য অনুভূতি সে এড়াতে পারে না, যেমন করে হোক চিনিকে তার পেতে হবে। এই যেন জীবনে পরম অকাঙ্ক্ষা তার। এ ছাড়া যেন বাঁচতে পারবে না সে।

সেদিন যে কথাগুলি হয়েছে চিনির বাবার সঙ্গে, মিহির সেগুলি বার বার মনের মধ্যে আলোচনা করলো এবং ঠিক করলো, আগামী কাল সে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করবে।

মিহির উঠলো খুব ভোরে, কারণ যতটা সম্ভব সকালে তাকে যেতে হবে। মিহির বেরুলো। প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে মিনিদের বাড়ির। হঠাৎ তার মনে হলো, প্রস্তাবটা করা ঠিক হবে কিনা এবং করলে ওঁরা অন্য কিছু মনে করবেন কিনা? একবার ভাবলো না, যাবে না ওখানে। আবার ভাবলো, একবার যাওয়া তো যাক।

প্রাতরাশের সময় তখন। টেবিলে বসে মিনি আর হিরণ চা খাচ্ছিল।

মিহিরকে দেখে খুশী হয়ে তারা বললো,

—আসুন স্যার, আসুন। চা খাবেন?

—তোমার বাবা কোথায়?

মিহির প্রশ্নটা করলো। ওদিক থেকে মিনির মা আসতে আসতে বললো,

—উনি দিল্লী গেছেন। তুমি বস, চা খাও।

মিহির জানত না। জানলে হয়তো সে আজ আসত না। এখন আর কি করে!

মিনি উঠে গেল তার মা'র কাছে। এক কাপ চা আর কিছু খাবার দিল রমলা মিহিরের টেবিলে। মিনিকে কি ইঙ্গিত করতে সে চলে গেল। মিনি চলে যাবার পর রমলা বললো,

—তোমার তো এবার বিয়ে করা উচিত মিহির?

—বিয়ে!

—হ্যাঁ, বিয়ে! আর বেশি দেরি করা উচিত নয় তোমার।

মিহির কিছুটা আশান্বিত হলো এই ভেবে যে, তার প্রস্তাব সে রমলা দেবীর কাছেই পেশ করতে পারে। তাই বললে,

—বিয়ে করা যেতে পারে, তবে কাকে করবো তা তো ঠিক করা চাই।

—সেটা যদি তোমার ঠিক না হয়ে থাকে, তা আমরা করবো। বলে, অল্প হেসে রমলা বললো—আমার ইচ্ছে, তোমার হাতে-গড়া মিনিকে তুমি বিয়ে করো।

প্রস্তাবটা আকস্মিক, অতর্কিত এবং অগ্রহণযোগ্যও! চুপ করে রইলো মিহির কিছুক্ষণ। রমলা আবার বললো,

—তোমার হাতে মিনিকে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই। হিরণ ছোট

—তোমাকে পেলে আমাদের কাজ-কারবারেরও সুবিধে হবে। তুমিই সব দেখতে পারবে।

নিঃশব্দে কথাগুলো শুনে গেল মিহির। তার কাছে এ একটা বড় রকমের প্রলোভন। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে সে বিরাট ধনী হয়ে উঠতে পারে! কিন্তু...

চা খেল মিহির। কোনও কথা সে কিন্তু বললে না। রমলা আবার বললো,

—তোমার হাতে মিনিকে দেবার ইচ্ছে আমার বরাবরের। এতদিন বলিনি, কারণ মিনি এতদিন ছোট ছিল।

—আমাকে কথাটা ভেবে দেখতে দিন, মা।

—বেশ বাবা, ভেবেই বলবে।

মিহির চলে এলো।

নিজের ঘরে এসে ভাবতে লাগলো মিহির, কি করা যায়? মিনি অবশ্য খুবই ভালো মেয়ে এবং তাকে বিয়ে করতে কারও আপত্তি হওয়া উচিত নয়; কিন্তু মিহিরের মন তো মিনিকে চায় না। সে যার স্বপ্ন দেখে সে মিনি নয়, চিনি—অসহায় এক তরুণী—যাকে বিয়ে করে সংসার করা প্রায় অসম্ভব। তবু মিহির তাকেই চায়। এখন সে কি করবে?

বিষয়টা নানা দিক থেকে ভেবে মিহির ঠিক করলো, এ সম্বন্ধে মিনির বাবার সঙ্গেই কথা বলা উচিত। কারণ, রমলা দেবীকে সরাসরি জবাব দেওয়টা যেন কেমন বিসদৃশ বলে মনে হচ্ছে তার।

মিহির পরদিন দুপুরবেলা মিনির বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেল তাঁর অফিসে। এ অফিস তার পরিচিত। বেশি দেরি তাকে করতে হলো না।

মিনির বাবা ডাকলেন,

—এসো মিহির। কি খবর তোমার?

—খবর ভালোই স্যার। একটা কথা বলতে এলাম।

—বল।

—আমার গার্জেন তো এখন আপনিই। আপনাকে বলা উচিত। ব্যাপারটা আমার বিয়ে নিয়ে। হয়তো আপনি শুনে থাকবেন মা'র কাছে।

—হ্যাঁ, কিছুটা শুনেছি। তা, তোমার মতামত কি?

—সেটাই আমি জানাতে এসেছি স্যার।

—বেশ, বল।

বিমলবাবু অপেক্ষা করছেন। মিহির একবার ভেবে নিল। তারপর বললো,

—মা আমার হাতে মিনিকে দিতে চান। আশা করি আপনি জানেন।

—হ্যাঁ, জানি। তোমার হাতে মিনিকে দিয়ে আমরা সত্যিই খুব খুশী হব।

—আমার সৌভাগ্য! কিন্তু আমার একটা কথা আছে, যা মাকে আমি

বলতে পারব না। হয়তো আপনিও বলতে পারবেন না। কথাটা আমার নিজস্ব।

—কি কথা মিহির? বলতে আপত্তি আছে?

—আজ্ঞে না, সে কথাই বলতেই এসেছি। মিনি খুব ভালো মেয়ে। তাকে পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু আমি আপনার ওই পঙ্গু মেয়েটির কথাই ভাবছি।

—তার আর কি করা যাবে মিহির! সহানুভূতি, স্নেহ জানানো ছাড়া তো তার বিষয়ে আর কিছু করার নেই। অবশ্য তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা আমি যথাসাধ্য করে যাব।

—শুধু খাওয়া-পরাই কি সব! ওতে কি মানুষের জীবন পূর্ণ হয়? বিশেষত! ওই রকম একজন প্রতিভাময়ী মেয়ের জীবন?

—না, নিশ্চয়ই না। কিন্তু কি করতে চাও?

—আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

মিনির বাবা নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে আনন্দের দীপ্তি দেখছে মিহির। বেশ কিছুক্ষণ পরে বিমল বললেন,

—এ তার পরম সৌভাগ্য মিহির, কিন্তু তুমি কি এটা পারবে করতে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি দান-পণ কিছুই চাইছি না। শুধু ওর চিকিৎসার জন্যে আমাকে কিছু নগদ টাকা সাহায্য করতে হবে আপনাকে।

—সেটা কিছু বেশি কথা নয় মিহির।

—আমি চেষ্টা করবো তাকে ভালো করতে। যদি ভাল না হয়, যেমন আছে তেমনি থাকবে।

—তোমার জীবন তাতে বিষময় হয়ে না যায়।

—আপনি আশীর্বাদ করলে অমৃতময় হয়ে যাবে।

—আমি সত্যই আনন্দিত মিহির, তবু একটা দিন সময় দাও! আমি একটু ভাববো।

—যে আজ্ঞে, আমি কাল দেখা করবো।

মিহির বিদায় নিল।

ওখান থেকে বাড়ি ফিরে মিহির আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে, আর ভাবছে,

বিমলবাবু নিশ্চয়ই তার পঙ্গু মেয়ের জন্যে এই সুযোগ গ্রহণ করবেন। আবার ভাবলো, পঙ্গু মেয়েটি তাঁর নিজের মেয়ে নয়। তাঁর নিজের মেয়ে মিনির জন্যই আমাকে নির্বাচন করা হয়েছে। সেটা তাঁদের বিশেষ স্বার্থের ব্যাপার! বিমলবাবু এবং রমলা দেবী কি এতটা স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজী হবেন। ওঁদের চোখে মিহির সুপাত্র সে টিউশনি করে ভালো রোজগার তো করেই; তাছাড়া একটা ভালো কলেজে প্রফেসারিও যোগাড় করেছে এবং ডক্টরেট হবার জন্যে থিসিস লিখছে। হয়তো পেয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সে কয়েকটা স্কুলের পাঠ্য-বই লিখেছে, যা বাজারে বেশ চালু। এই সব নানা কারণে মিহির সত্যই যোগ্য ও সুপাত্র। বয়স তার বত্রিশ—দেখায় ত্রিশের নীচে। চেহারাও তার অতি সুন্দর।

পাত্র হিসাবে মিহির যতই ভালো হোক, মিনির সঙ্গে তার বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য আছে এবং মিনিকে সে কোনোদিন প্রেমের দৃষ্টিতে দেখেনি। ছোট বোনের মতোই দেখে এসেছে এতদিন, আর যতটা তার জানা তাতে মনে হয়, মিনিও মিহিরের দিকে প্রেমের চোখে চায়নি। বড়দার মতো সে শ্রদ্ধা করে মিহিরকে। এ অবস্থায় রমলা দেবীর নির্বাচন খুব প্রশংসনীয় বলে মনে করে না সে। যদি দরকার হয়, এই কথাই বলবে বিমলবাবুকে এবং রমলা দেবীকেও।

যদি বিয়ে মিহিরকে করতেই হয় ওখানে, তো চিনিকেই করবে, অন্যথা ও বাড়িতে বিয়ে সে করবে না। মিনিকে বিয়ে করতে সে একান্ত নারাজ, এই কথা সে জানিয়ে দেবে। পঙ্গু চিনিকে নিয়ে জীবন-যাপন করা যে কতখানি কষ্টকর হবে, চিন্তাশীল মিহির তা বারবার ভাবলো। কিন্তু কে জানে, কেন চিনির প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ দুর্বার হচ্ছে? ওর সবসময় মনে হচ্ছে, চিনিকে সে পেলে তার বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে। কেন যে এমন মনে হচ্ছে সে জানে না, মনকে বোঝাতেও পারলো না।

চিনিকে মাত্র একদিন চোখে দেখেছে মিহির, অবশ্য তার সম্বন্ধে আগ্রহ এবং মিনি ও হিরণ মারফত খবরাখবর নেওয়া অনেকদিন থেকেই চলছে—তার গানও শুনে এসেছে কিছুদিন যাবৎ। প্রাণের কোন গোপন তারে যেন দিবারজনী সেই গানের সুর ঝঙ্কৃত হয়, কে জানে কেন এই আকর্ষণ।

মিহির অনেক চেষ্টা করেও এর কারণ বার করতে পারলো না। অবশেষে ঠিক করলো, এই প্রেম নৈসর্গিক। একে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা শুধু নয়—

জীবনের বিড়ম্বিত করা। মিহির তা করবে না—সে চিনিকে বিয়ে করবে। তার দক্ষিণ-অঙ্গ অবশ, তা হোক। চিনি প্রায় ইনভ্যালিড—তাও হোক। চিনি তার প্রিয়তমা। তাকে যতটা সম্ভব সুখী করবে মিহির।

নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে চিনি। আর ভালো যদি নাও হয় তাহলেও চিনি তার বুকে থাকবে! এ বিষয়ে আর কোনও রকম দ্বিধা-দ্বন্দ রইলো না মিহিরের মনে। চিনিকে সে নিশ্চয়ই বিয়ে করবে।

দিন চার পাঁচ পরে মিহির আবার দেখা করলো বিমলের সঙ্গে। বিমল তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করলেন,

—কি ঠিক করলে মিহির?

—ঠিক করাই তো আছে স্যার! বিয়ে আমি চিনিকেই করব। অবশ্য এখন আপনার অনুমতি পেলেই হয়!

—আমার পক্ষে এ একটা সৌভাগ্য মিহির, তবে মিনির মা তোমাকে মিনির জন্য চেয়েছিল।

—তাঁর নির্বাচনে ভুল হয়েছে। মিনি আমার ছোট বোনের মতো। সে আমার বোনই থাকবে।

—হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। যাক, তাহলে এখন সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলি!

—তার আগে আমাকে চিনির সম্মতি নিতে হবে স্যার। আপনি কি তাঁকে কোনো কথা বলেছেন?

—না! হয়তো মিনি বলে থাকবে। খুব সম্ভব বলেছে। ওর মা তোমার কথা শুনে বিরক্তই হয়েছে। সুতরাং একথা নিয়ে বাড়িতে বিশেষ আলোচনা হয়নি।

—আমি কি অনুমতি পাব চিনির সঙ্গে দেখা করবার?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। তাহলে এখনি চল।

—আমি সন্ধ্যার দিকে যাব। আপনি যেন বাড়িতে থাকবেন।

—থাকব। তোমাকে আমি তার কাছে পৌঁছে দেব। যদি সে রাজী হয় তাহলে আমার সম্মতি দেওয়াই রইল।

—রাজী কি হবেন না ভাবছেন?

—চিনি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে মিহির। নিজের অসহায়তা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সজাগ। শিক্ষিতা মেয়ে সে। কে জানে কি বলবে।

—বেশ, তাঁর মুখ থেকেই শুনব আমি সে কথা।

—আচ্ছা, খুব ভালো কথা। তুমি ক'টায় আসবে?

—বৈকাল পাঁচটায়। আমি এখন আসি।

মিহির প্রণাম করলো বিমলকে। তারপর সটান চলে এলো বাড়ি। বিমলের অফিসেই কথা বলে এলো মিহির।

বিকেল পাঁচটায় হাজির হলো মিহির বিমলবাবু বাড়ি। তিনি উপরে নিয়ে গেলেন তাকে ঠিক ছ'টার সময়, অর্থাৎ প্রায় একঘন্টা পরে। হয়তো চিনিকে সাজগোজ করবার সময় দেবার জন্যে, অথবা তাকে মনে মনে তৈরি হবার জন্যে বিমল এতখানি দেরি করলেন। মিহির গিয়ে দেখল, চিনি তার ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে আছে।

নমস্কার করলো মিহির। চিনি অতি বিষণ্নমুখে মাথা নুইয়ে প্রতি নমস্কার করলো। বিমল বললেন,

—তোমরা কথা বল, আমি তোমার জন্যে এখানে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চলে গেলেন বিমল। এলো মিনি! বেশ হাসিখুশী ভাব তার। এসেই বললো,

—আগে দিদি একখানা গান গাইবে, শুনুন। তারপর আপনাদের কথা হবে।

—আচ্ছা!

চিনি কিছুটা ইতস্তত করছে। মিনি জোর করে ওকে ধরে বললো,

—গাইবি—গাইতে হবে। উনি তোর গান ভালোবাসেন। গা, দিদি।

—বাজনা?

—আমি বাজাচ্ছি।

মিনি আরম্ভ করে দিল একটা যন্ত্র নিয়ে। এ সঙ্গত নয়, কোনোরকমে গাওয়া চলে মাত্র।

চিনি আস্তে আস্তে গাইতে আরম্ভ করলো ঃ

সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারাদিনের তৃষা,
কেমন করে মেটাব গো—
খুঁজে না পাই দিশা।....

গান চলছে আর মিহির মনে মনে ভাবছে। সত্যি, সারাজীবন যেন সে ক্লান্ত হয়ে এই মেয়েটিকেই খুঁজছে। কিন্তু এই একান্ত অক্ষম অসহায়কে নিয়ে সে কি করবে! ভাবতেই মিহির নিজেকে তিরস্কার করলো। না, এ কথা সে চিন্তাই করবে না। একে নিয়েই সে জীবনের পথে পাড়ি দেবে।

চা এসে পড়লো। তৈরি করে দিয়ে মিনি চলে গেল। চিনি নতমুখে বসে আছে। মিহির বললো,

—আমার কথা শুনেছেন?

—হুঁ!

—আপনার মত কি?

চিনি চুপ করে আছে। প্রায় দু'মিনিট কথা বললো না সে। আবার মিহির প্রশ্ন করলো,

—এ বিবাহে আপনার অমত হবে কি?

—আমার অমত! চিনি একটু থামলো, তারপর ঢোঁক গিলে বললো, আমার এমন সৌভাগ্য কল্পনার বাইরে। কিন্তু আমি কারও জীবনকে বিড়ম্বিত করতে চাইনে। আপনি আমায় মার্জনা করুন।

—সে কি! আমি জীবনে বিড়ম্বিত কেন হবো? ও বিষয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আপনার দেহটা বাদে বাকি সবই আমি পাব। প্রেম-ভালোবাসা—সেগুলো কি কিছুই নয়?

—তা বলছিনে, সেগুলো খুবই মূল্যবান। কিন্তু আধার ছাড়া কি আধেয় থাকে? দেহকে বাদ দিয়ে দেহাতিতী শুধু কল্পনার বিলাস মাত্র।

—আমি তো মনে করিনে। দেহ তো বাদ পড়ছে না। দেহটা একটু অপটু—অক্ষমতাও আছে। তাতে কি? যা আছে, আমি তাতেই জীবনভোর এবং জীবনের পরেও তৃপ্তি পাবো। তুমি রাজী হও চিনি। বিশ্বাস কর, তোমাকে না-পাওয়ার দুর্ভাগ্য আমার পক্ষে হবে মর্মান্তিক।

চিনি অতি বিস্ময়ে তাকিয়েছিল মিহিরের মুখপানে। অশ্রুসজল তার মলিন মুখ দেখে আস্তে আস্তে বললো,

—আপনার এই আশ্চর্য প্রেম আমি কেমন করে লাভ করলাম জানিনে। কেমন করে এই স্বর্গীয় প্রেমের সম্মান আমি দিতে পারব—এর মর্যাদা রাখতে পারব?

—তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তুমি শুধু শুয়ে শুয়ে আমায় ভালোবাসবে—আমাকে ভালবাসতে দেবে—আর আমার ভালোবাসা গ্রহণ করবে। এর বেশি কিছু চাইনে আমি তোমার কাছ থেকে।

তাতে কি আপনার জীবন পূর্ণ হবে—সংসার সজীব হবে?

না-হয় না হবে! এই পৃথিবীতে পুতুলকে ভালোবেসে জীবন কাটিয়েছে এমন মানুষের কথা শোনা যায়। ফুলকে ভালোবেসে ফুল হয়ে গেছে, এমন উদাহরণও আছে। তুমি রাজী হও চিনু।

—বেশ হলাম। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।

—বল!

—সংসার করবার জন্য আপনি অন্য একজনকে বিয়ে করবেন. যে তার দেহ দিয়ে আপনার জীবনের অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করবে।

—না! এ অনুরোধ রাখার অর্থ, আমার প্রেমের ফাঁসি হওয়া। না, এ হবে না।

বলতে বলতে যেন স্বর্গীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মিহিরের মুখ। চিনি চেয়ে দেখছে এই মুখখানি।

এমন একটা অবাস্তব ঘটনা যে ঘটতে পারে, অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না। একটা ইন্‌ভ্যালিড মেয়েকে, তা সে যত রূপসী হোক, জেনে-শুনে-বুঝে কোনো শিক্ষিত ভদ্রসন্তান বিয়ে করতে চায় না। মিহির কিন্তু তাই চাইলো এবং নীচে এসে বিমলকে জানাল যে, সে চিনির সম্মতি পেয়েছে।

রমলাও ছিল সেখানে। মুখখানা বিকৃত করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বললো,

—তা ভালো! চিনির একটা কিছু গতি হলে আমরাও নিশ্চিন্ত হই।

কথাগুলোর মধ্যে স্নেহ-মমতার লেশমাত্র নেই, বরং কিঞ্চিৎ উষ্মা এবং ব্যঙ্গ রয়েছে। মিহির সুশিক্ষিত তীক্ষ্ণধী যুবক। সে রমলার মনোভাব বুঝে গেল, কিন্তু কিছু বললো না। ওরা আরো কিছু বলে কিনা শোনবার জন্য অপেক্ষা করছে। বিমল বললো,

—আচ্ছা, আমি তাকে একবার জিজ্ঞেস করে, পরে বিয়ের দিন ঠিক করব।

—যে আজ্ঞে। বিমলের কথার উত্তরে মিহির জানালো এবং নমস্কার করে বিদায় চাইল। রমলা কি যে ভেবে বললো,

—ওকে আমি অতি যত্নে মানুষ করেছি। ওর বিয়ে হলে আমার থেকে সুখী আর কেউ হবে না। তবে, আমি তোমার কথাও ভাবছি। তোমার জীবনটাও পঙ্গু না হয়ে যায়।

—যায় যাবে! আমার সে-দুঃখ সইতে হবে।

—বেশ! আমার আর কিছু বলবার নেই। আসছে মাসেই বিয়ে হোক।

—যে আজ্ঞে।

মিহির বিদায় নিল।

পথে আসবার সময় মিহির ভাবতে লাগলো, রমলা দেবী তাঁর মেয়ে মিনির সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সে সে-প্রস্তাব গ্রহণ না করায় রমলা দেবী যে অপ্রসন্ন হবেন, এ তো জানা কথা। তবে বিমলবাবু খুব খুশী হয়েছেন, এটা তাঁর চোখ মুখ এবং কথাবার্তায় বোঝা যায়। যাই হোক, মিহির বিয়ের পরই চিনিকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে আসবে এবং যতটা তার ক্ষমতায় হয় চিনির চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। চিনি যে ভাল হবে এটা অবশ্য দুরাশা, তবু চেষ্টার ত্রুটি করবে না মিহির।

ভাবতে ভাবতে মনটা তার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু চিনির সঙ্গে আর একবার দেখা তার হওয়া দরকার। আজই হতে পারতো। কিন্তু মিহির সে ইচ্ছা জানায় নি বিমল বা রমলাকে। মিনির সঙ্গেও আজ দেখা হয়নি তার। মিনিও কি চটলো নাকি তার ওপর। হবেও বা! চটবারই তো কথা। মিনির কাছে চিনির মনের কথা কিছু হয়তো জানা যেতে পারতো, সেটা আর এখন হবে না।

নানা রকম চিন্তার মধ্যে দিন-রাত কেটে গেল মিহিরের। পরদিন বিকেলে কিন্তু সে আর স্থির থাকতে পারলো না। চিনিকে একবার দেখে আসা দরকার। তার মতের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা জানতে হবে।

বেরুলো মিহির। পথে ভাবছে, কি জানি চিনির সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি

সে পাবে কিনা? হয়তো পাবে না! মনটা তাই আলোড়িত হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছালো এসে।

সামনেই মিনি। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললো,

—শুনে আমরা সবাই খুশী হলাম স্যার, আসুন, আসুন। বসুন।

—তোমার দিদির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—স্বচ্ছন্দে। একবার কেন, বারবার....যতবার ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে!

—এখন কি যেতে পারি?

—হ্যাঁ। সোজা চলে যান ওপরে। দিদি ছাদের বাগানে একা বসে আছে।

—তুমি একটু সঙ্গে চল মিনি।

—ওরে বাবা! আমি কেন যাব? আমি এখন ব্যাডমিন্টন খেলতে যাচ্ছি। আপনি চলে যান ওপরে।

মিনি সত্যি-সত্যি বেরিয়ে গেল। মিহির ভাবছে, সে এখন কি করবে—ওপরে উঠে যাবে নাকি। এই সময় রমলা নামলো সাজগোজ করে। কোথায় যাবে! মিহিরকে দেখে বললো,

—কি খবর?

—চিনির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই!

—চলে যাও না ছাদের ঘরে। আমি যাচ্ছি আমার বোনের বাড়ি। উনি এখনও ফেরেননি অফিস থেকে। তাতে কি হয়েছে? তুমি যাও ওপরে। বলেই, একটু থেমে চাকর রামকে ডেকে রমলা বললো—ছাদের ঘরে তোর বড়দিকে আর মিহিরকে চা-খাবার দিস।

রমলা চলে গেল।

মিহির আর কোনোরকম ইতস্তত করলো না। একটা শব্দ করে ওপরে উঠে এলো মিহির।

চিনি হেনা গাছটার ঝোপের আড়ালে বসেছিল। উঁকি দিয়ে দেখলো, তার বিষণ্ণ মুখে ক্ষীণ হাসি।

মিহির এসে বসলো চিনির কাছে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে। মিনিট খানেক কোনো কথা নেই। চিনি নতমুখে বসে আছে। মিহিরই মুখ খুললো প্রথমে। আস্তে আস্তে বললো,

—আসছে মাসে তোমায় নিয়ে যেতে পারব?

ক্ষীণ হাসি হাসলো চিনি। হাসিটা তার অত্যন্ত মিষ্টি, কিন্তু বড্ড করুণ। মমতায় সারা মন-প্রাণ ভরে উঠলো মিহিরের। বললো,

—বিশ্বাস হচ্ছে না।

ওর দিকে তাকিয়ে চিনি প্রায় পাঁচ-সাত সেকেণ্ড দেখলো, তারপর মুখটা নামিয়ে আস্তে আস্তে বললো,

—আমার যেন স্বপ্ন মনে হচ্ছে! আমি কি সত্যিই জেগে আছি।

—হ্যাঁ। কিন্তু স্বপ্ন কেন মনে হচ্ছে তোমার?

—এতবড় সৌভাগ্য আমার কি হবে?

—হবে, হয়েছে। আমার ঘর আলো করে থাকবে তুমি।

—আমি তো পঙ্গু। আমাকে নিয়ে কি যে আপনি করবেন বুঝি না!

—তোমাকে আমার জীবনের সাথী করেই সারা জীবনটা কাটাব।

—পারবেন তো? দেখুন, আমি এখনও আপনাকে সতর্ক হতে বলছি।

—নিশ্চয় পারব। আর এ না হলে আমার পক্ষে বাঁচা সঙ্কট হবে।

—কেন? আমি কি এমন....

—তা জানিনে। আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার অনন্তকালের সঙ্গিনী।

চিনি আর কিছু বললো না। বেয়ারা চা-খাবার নিয়ে এলো। একহাতে চা ধরতে অসুবিধা হয় চিনির। মিহির সাহায্য করছে। বললে,

—আমার বাঁ-হাতটা দিয়ে তোমার ডান-হাতের অভাব মেটাব।

—জানি না আমার অদৃষ্টে কোথায় এত সুখ লেখা ছিল?

চা তৈরি করে দিল মিহির চিনিকে। ওর ডান হাত অকমর্ণ্য কিন্তু বাঁ-হাতের খুব ভালো কাজ সে করতে পারে। আজ কিন্তু বিশেষ কিছু করলো না। মিহিরই চা করলো, খাবার ঠিক করে দিল চিনিকে। খেতে-খেতে বললো,

—একটা গান গাইবে?

—গাইতে পারি, কিন্তু বাজাবেন তো?

হ্যাঁ। আমি অবশ্য খুব ভালো বাজাতে পারিনে।

—আপনি হারমোনিয়ামটায় হাওয়া দিন, আমি বাজাচ্ছি।

মিহির হাওয়া দিতে লাগলো। চিনি বাজাতে বাজাতে গাইলো ঃ

সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারাদিনের তৃষা,

কেমন করে মেটাব গো—

খুঁজে না পাই দিশা।....

গান শেষ হলে মিহির বললো,

—এই গানটাই তোমার বিশেষ প্রিয়, তাই না?

—হ্যাঁ। খুব ভালো লাগে আমার।

—বেশ, আর একটা গাও।

চিনি এবার গাইলো ঃ

এত প্রেম, সুখী এত ভালোবাসা

কেমনে আছে সে পাসরি।

সেথা কি বহে না মলয় সমীর—

সেথা কি বাজে না বাঁশরী?

অতি মধুর তার কণ্ঠস্বর। সন্ধ্যার আকাশকে যেন মন্দির করে তুলছে। মিহির গান শুনলো পরিতৃপ্ত হয়ে। বললো,

—তোমাকে ভালো করবার চেষ্টাও আমায় করতে হবে।

—ও আর হবে না। বাবা বিস্তর চেষ্টা করেছেন, কোনো ফল হয়নি।

—আমি তোমায় বিদেশে নিয়ে যাব।

—যাবেন, কিন্তু অনর্থক অর্থ নষ্ট হবে! ভালো আমি আর হবো না।

—না হও না-ই হবে। আমার বুকে লুটিয়ে থাকবে তুমি।

চিনি তাকালো এবং মৃদু হেসে আবার বললো,

—আমার 'আমি'-কে আমি সমর্পণ করলাম। এখন আপনার যা ইচ্ছে করবেন। আমার আশঙ্কা, আমি আপনার জীবন নষ্ট না করি।

—আমার জীবন সার্থক হয়ে উঠবে তোমার পরশে।

চিনি আর কিছু বললো না। মিহির আরও মিনিটখানেক বসে রইলো। হয়তো আরও কিছু কথা বলতে চায়। কিন্তু হিরণ এসে পড়লো। বললো,

—স্যার! আমাকে একটু পড়াবেন?

—আচ্ছা চল। পড়তে বসগে, আমি যাচ্ছি।

হিরণ কিন্তু গেল না। ওর ইচ্ছে, মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

—আসুন স্যার!

হ্যাঁ যাই। চিনিকে বললে—আজ আসি তাহলে!

—আসুন।

মিহির ধীরে ধীরে নেমে এলো নীচে। এসে হিরণকে পড়াতে বসলো। কিছুক্ষণ পরে রমলা এলো, এসে বললে,

—কথা তো হলো। এবার বিয়ের সব ব্যবস্থা করি?

—হ্যাঁ মা। কথা পাকা!

পরদিন কি ভেবে মিহির গেল তার এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ি। সদ্য বিলেত ফেরত। এখনও খুব পশার জমাতে পারেনি। নাম সত্যব্রত রায়। উনি সব কথা শুনলেন মিহিরের মুখ থেকে। ভেবে বললেন,

—তাঁকে না দেখে আমি কিছু বলতে পারবো না। যদি দেখা যায়, রোগটা সারতে পারে, তাহলে তাঁকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব। তুই আমাকে একটা 'কল' দে।

—বেশ, আমি কালই 'কল' দেব তোকে।

পরামর্শ করে মিহির বাড়ি ফিরলো।

পরদিন সকালেই সে বিমলের বাড়ি গেল। রমলা এবং বিমল চা খাচ্ছিল। মিহিরকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বসাল। চা দিয়ে প্রশ্ন করল,

—কি খবর মিহির?

—খবর ভালো। আমার এক বন্ধু বিলেত-ফেরত ডাক্তার। কাল তাকে বললাম চিনির অসুখের কথা। শুনে সে একবার দেখতে চেয়েছে। অনুমতি করেন তো আজই তাকে 'কল' দিই।

—বেশ তো দাও। কখন আসবেন তিনি?

—ফোন করে জিজ্ঞাসা করব?

—যাও, ফোন কর।

মিহির উঠে গিয়ে ফোন করলো ডাঃ সত্য রায়কে। ও বললো,

—এখন হাসপাতালে যাচ্ছি। বৈকাল চারটে-পাঁচটায় যাব ওখানে।

—আচ্ছা, তাই আসিস।

বলে, ফোন ছেড়ে দিল মিহির। এসে জানালো,

—বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে আসবেন ডাঃ রায়।

—কেমন ডাক্তার তিনি?

—তিনি অবশ্য বড় ডাক্তার এখনও হননি। তবে ধনীর ছেলে—বিলেতে বহু ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে। হয়তো কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে আমাদের পরিচয় দিতে পারেন।

—আচ্ছা, খুব ভালো। দেখ চেষ্টা করে। তবে তার আগে চিনিকে তুমি বিয়ে কর।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—আসছে মাসেই বিয়ে হবে। কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে কথা তো পাকা আছে। আমি বিকেলে আসব ডাঃ রায় আসার আগেই।

মিহির চলে গেল বিকেলে আসবার কথা বলে।

বিকেলে একটু আগেই এলো মিহির। বিমল এবং রমলা অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। এই অপেক্ষা করার অবশ্য অন্য একটা কারণ আছে। সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

ডাঃ সত্য রায় এসে পৌঁছল পাঁচটার কাছাকাছি। সাদরে তাকে অভ্যর্থনা করলো ওরা। নমস্কারাদি আদান-প্রদানের পর স্বয়ং রমলা বললো,

—আসুন, ডাঃ রায়! আমিই ইনট্রোডিউস্ করে দিই।

—ধন্যবাদ! চলুন।

ওকে নিয়ে উপরে এলো রমলা। সঙ্গে বিমল এবং মিহির। চিনি একটা সোফায় শুয়েছিল। পাশে ছিল সুসজ্জিতা মিনি। ও গাইছিল ঃ

ওগো সুন্দর! মনের গহনে তোমার মুরতিখানি
ভেঙে ভেঙে যায়—মুছে যায় বারে বারে
বাহির বিশ্বে তাই তো তোমারে টানে!

সুন্দর সুমিষ্ট গলা। সুন্দরী তরুণী মিনি। ডাঃ সত্য রায় দেখলো শুনলো তার গান। গানটা শেষ হলে রমলা ওদের পরিচয় করিয়ে দিল....চিনি তাঁর পালিতা কন্যা—মিনি আত্মজা।

এবার রোগিণীকে পরীক্ষা করবার কথা। কিন্তু চা-খাবার এসে পড়লো ডাঃ রায় সবিনয়ে বললো,

—আগে আমি রোগীকে দেখি।

—তাড়া কিসের! চা-টুকু খেয়ে তারপর দেখবেন! বিমল বললো।

—আচ্ছা।

ডাঃ সত্য রায় ছাদে-পাতা চায়ের আসরে এসে বসলো।

মিনি চা পরিবেশন করছে। চিনির রোগের ইতিহাসটা বলছে বিমল,

—আমার এক বন্ধুর মেয়ে চিনি। জন্মের পরেই মা মারা যায়। আমাদের তখন কোনও সন্তান ছিল না। তাই ওকে আমি নিয়ে আসি সন্তানস্নেহে মানুষ করবার জন্য এবং এতদিন আমরা তাই করেও এসেছি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! এ একটা অসাধারণ কৃতিত্ব এবং মানবতার পরিচয়। অসুখটা হলো কবে থেকে?

—ওর সাত বছর বয়সে টাইফয়েড রোগ হয়। ডানদিকের অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যায় সেই অসুখে। আর সবই ওর ভালো। এমন শান্ত, বুদ্ধিমতী মেয়ে আর দেখা যায় না। আমার ছেলেমেয়ে তো 'দিদি' বলতে অজ্ঞান। ওর কোনও রকম অযত্ন ওরা সহ্য করতে পারে না। মিহির ওকে বিয়ে করবে জানতে পেরে ভাই-বোনে নাচছে আনন্দে।

—সত্যিই খুব ভালো ছেলে মেয়ে আপনার।

চা খাওয়া শেষ হলো। চিনি এতক্ষণ তার চেয়ারে বসে ছট্‌ফট্‌ করছে। তার এই অধীরতা অন্য আর কিছুর জন্য নয়, তাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার কি বলেন তা জানবার জন্যে।

ডাঃ রায় এবার এলেন চিনিকে দেখতে। তার ডান-হাত এবং ডান-পা দেখলেন। আরো কি-সব দেখে পরীক্ষা করলেন। প্রশ্নও কিছু করলেন চিনিকে তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন,

—রোগটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে। চেষ্টা অবশ্য করা যেতে পারে, তবে ফল কি হবে বলা যায় না!

—চেষ্টার কোনো ত্রুটি তো করা হয়নি। এখন আরও কিছু যদি করা যায় তো দেখুন! বিমলবাবু বললেন কথাগুলো।

—চলুন, বাইরে যাই।

সত্য রায় স্টেথেস্কোপ কাঁধে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে রমলাও এলো। বিমল তখনও চিনির খাটের কাছে দাঁড়িয়ে। বললো,

—চিনু! কাঁদছিস কেন মা?

—বাবা! মিহিরবাবুকে বলো, আমাকে নিয়ে তাঁর কোনও কাজ সিদ্ধ হবে না! তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে অন্য মেয়েকে বিয়ে করুন।

—ও তো শুনবে না, মা। ও যদি তার মতে স্থির থাকে, তাহলে আমি তোকে দেব মিহিরের হাতেই।

—না বাবা, না! এতে তাঁর জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

—ও তো নির্বোধ নয়, মা। দেখি, ডাক্তারের মতামত শুনে সে কি বলে? কাঁদিস্‌নে। কথা দিলাম, তোর অমতে কিছু করা হবে না।

বিমল চলে এলো। মিহির এতক্ষণ বাইরেই ছিল—ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। স্বয়ং বিমল আর রমলা ডাঃ রায়কে নিয়ে যাওয়ায় সে আর ভিড় বাড়াতে চায়নি। এতক্ষণে ডাক্তারের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো,

—কি দেখলি সত্য? ভালো হবে?

—না।

পরিস্কার উত্তর দিল ডাঃ সত্য রায়! রমলা বললো,

—তাহলে বিলেত পাঠানোর আর কি দরকার?

—কিছু না। ওকে কেউ ভালো করতে পারবে না। কারণ, ডান-অঙ্গের সব নার্ভই শুকিয়ে গেছে। সে আর ঠিক হবে না। অকারণ খরচ করতে বলব না আমি। বরং আমার সাজেশন, সেই টাকাটা ওর নামে রেখে দিন। ভবিষ্যতে ওর কাজে লাগবে।

—তাহলে বিয়ে?

—ওর বিয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই। অক্ষমতা ওর কোনোদিন কাটবে না। সন্তানাদির আশা তো নেই-ই। স্বামী-সংসর্গও ওর পক্ষে কষ্টকর হবে। তারপর যদি সন্তান-সম্ভবা হয় তো ওকে আর বাঁচাতে পারা যাবে না। সেটা হবে ওকে নিজের হাতে হত্যা করা।

কথাগুলো যেন নিষ্ঠুর বজ্রের মতো বাজছিল মিহিরের বুকে। হতাশ দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল বন্ধু সত্যর পানে। বললো,

—এত দৃঢ় তোর অভিমত?

—হ্যাঁ। বলিস তো আমি লিখে দিতে পারি। ওকে বিয়ে করলে তোর নিজের যাই হোক, ওকে হত্যা করা হবে। আচ্ছা, আসি তাহলে। নমস্কার।

—না! আর একখানা গান শুনে যাও বাবা! মিনু, গা তো মা।

অতএব সত্য রায়কে বসতে হলো। গান গাইছে মিনি।

মিহির এবার বসলো চিনির কাছে। চিনির চোখে জল। বললো,

—আমায় ক্ষমা করবেন মিহিরদা। আপনার ঐ প্রস্তাব বাতিল করুন।

—না-না, চিনি। আমার প্রস্তাব ঠিকই আছে। ও বাতিল করা সম্ভব নয়। বিয়ে আমি তোমায় করবই। তাতে যাই হোক, আমাকে তুমি শুধু মেনে নিও। আমার আর কারও অভিমত নেবার দরকার নেই।

—কি আপনি করবেন আমাকে নিয়ে।

—বহুবার বলেছি তো, তুমি শুধু আমার অন্তর আলো করে থাকবে।

চিনির চোখে আবার জল এলো। এই প্রেম, এই স্বর্গীয় ভালোবাসার প্রতিদান সে দেবে কি করে? তবু বললো,

—আমার কিছু বলার নেই। আজ যেটুকু আমি পেলাম, তাতেই আমার জীবন ভরে থাকবে। এরপর আপনি যা ইচ্ছে করবেন। একটু থেমে বললো—আমার সিঁথিটায় একটু ছোঁয়া দিয়ে যান।

মিহির ওর সিঁথি স্পর্শ করলো। চিবুকে আঙুল দিয়ে আদর করলো। চোখে-মুখে একটা চুমা খেল। তারপর নিঃশব্দে চলে এলো বাহিরে।

সত্য রায় বেরুচ্ছে। মিহিরও তার সঙ্গে বেরিয়ে এলো। সত্য বললো,

—আচ্ছা, কি আহম্মকী করছিস তুই? ওকে বিয়ে করে কি হবে?

—কি জানি কি হবে। তবে, বিয়ে যদি করি ওকেই করব আমি।

—তোর হাতে আমার ছোট বোন শুক্তিকে দেব আমরা। ওকে বাদ দে মিহির।

—শুক্তিকে? অতবড় স্বপ্ন আমায় দেখাস নে সত্য। শুক্তির যোগ্য নই আমি।

—তুই যোগ্য কিনা আমরা দেখব। শোন্, বোকামী করিসনে। ওর অসুখ সারবে না কোনোদিন। আচ্ছা চললাম।

ডাঃ রায় চলে গেল।

সব যেন শূন্য করে দিয়ে গেল মিহিরের। শুধু শূন্যই করলো না, একটা আশাতীত আশা জাগিয়ে দিয়ে গেল তার মনে। শুক্তিকে সে বিয়ে করতে পারবে, এমন কল্পনা কোনোদিন করেনি সে।

উত্তেজিত মনটাকে একটু ঠান্ডা করবার জন্যে মিহির একটা পার্কে গিয়ে ঘসলো। ভাবতে লাগলো, শুক্তিকে কেন সে বিয়ে করবে? কেনই-বা সত্য ডাক্তার এমন প্রস্তাব দিল? কোন্ যোগ্যতা আছে মিহিরের, যাতে সে ওই লক্ষপতির পরমাসুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করতে পারে? অনেক ভেবেও কোনো কুল-কিনারা পেল না মিহির। অতঃপর ভাবলো, সে এখন অধ্যাপক। তাই হয়তো সত্য রায় তাকে তার বোনের জন্য নির্বাচন করেছে। কিন্তু না, এ কিছুতেই হতে পারে না।

চিনির মুখখানা মনে পড়ছে তার। আত্মসমর্পিতা ঐ তরুণী হয়তো তার অপূর্ণ আশা পূরণ হবার আশায় অধীর হয়ে রয়েছে। এই প্রলোভন মিহিরই তাকে দেখিয়েছে। এখন নিজে সে শুক্তির লোভে চিনিকে ত্যাগ করলে মানুষের ধর্মের মর্যাদা থাকে না। না, এরকম সে ঘটতে দেবে না। অশান্ত মনকে কিছুটা শান্ত করে বাড়ি ফিরলো মিহির।

পরদিন বৈকালে মিহির গেল সত্য রায়র বাড়ি। সত্য রায় তাকে অনুরোধ করে গেছে, তাই গেল সে।

সত্য তখন বাড়ি ছিল না। মিহিরকে অভ্যর্থনা করলো শুক্তি, সুবেশী সুন্দরী তরুণী। বললো,

—নমস্কার! আসুন। দাদা একটু বাইরে গেছেন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরবেন।

—আচ্ছা। আমি তাহলে পরে আসব।

—না, বসুন। ততক্ষণ অন্ততঃ এককাপ চা খান।

—তা দিন। বলে, বসলো মিহির। এই আমন্ত্রণ সে উপেক্ষা করতে পারলো না।

বেয়ারা এলো। চা-খাবার এলো তার সঙ্গে। শুক্তি পরিবেশন করছে। মিহির এর আগে দেখেছে শুক্তিকে। তবে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় নি। আজ সে অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছে শুক্তির—এত নিকটে—ছোঁয়া যায় যেন।

শুক্তির সাজসজ্জা পরিপাটি। তার রূপৈশ্বর্যকে সে শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছে বর্তমান যুগের প্রসাধনের দৌলতে। তার সর্বাঙ্গ ঘিরে একটা সুমিষ্ট সৌরভ—দেহলতায় একটা হিল্লোলের মাধুর্য যেন মনোহারিণী। প্রলোভনটাকে জয়

করবার চেষ্টা করছে মিহির। কিন্তু এই দুর্জয় লোভ, এতটা আশা কেন দিল সত্য তাকে! তার জীবনে শুক্তির আশা সে কোনোদিনই করেনি।

চিনির উপর তার প্রেম কি নিছক সহানুভূতি? একটা করুণার ছদ্মবেশ। হয়তো, তাই। নইলে শুক্তিকে দেখে সে এতটা মুগ্ধ হবে কেন? কেনই-বা শুক্তির প্রতি এই আকর্ষণ তার? মিহির আত্মসমালোচনা করছে—আত্মবিশ্লেষণ করছে।

এবার মিহিরকে গান শোনাবে শুক্তি। তার আয়োজন চলছে অন্য একটা ঘরে। একজন ওস্তাদ, খুব সম্ভব শুক্তির গানের মাষ্টার, যন্ত্রগুলো ঠিক করছেন। ঘরে আরো দুটো মেয়ে রয়েছে। মাস্টারমশাই ডাকলেন,

—এসো শুক্তি।

—হ্যাঁ স্যার, যাই। আসুন মিহিরদা। দাদা না আসা পর্যন্ত গান শুনুন। গান তো ভালবাসেন আপনি?

—হ্যাঁ। চলুন।

আসরের একধারে এসে বসলো মিহির। শুক্তির গলা অসাধারণ কিছু নয়। তবে গান শিখছে ভাল ওস্তাদের কাছে। তার গানের মূর্চ্ছনায় একটা অব্যক্ত আনন্দ জাগে। সত্যি ভাল লাগলো মিহিরের শুক্তির গান। মনে মনে বললো, বেশ সুন্দর গায় তো শুক্তি?

—আপনি একখানা গান শোনান মিহিরদা।

—গান শোনাব? আমি?

—কেন?

—আমার গলা তো গর্দভের! তার ওপর গানের ব্যাকরণ আর স্বরলিপি দেখলেই ভয়ে আঁতকে উঠি। এর পরের কারণটা আরো করুণ।

—কেন?

—গান আমার দ্বারা হবে না। তাই বাজনা শিখতে গিয়েছিলাম—বেহালা। একদিন আমার গুরু রেগে আমার পিঠে ছড় দিয়ে এক চাবুক মেরেছিলেন—এখনও তার দাগ আছে।

মিহির তার আদ্দির পাঞ্জাবির কিছুটা তুলে দেখাল। সবাই হেসে উঠলো। শুক্তি কাছেই বসে আছে। মিহিরের দেহেরকান্তি সুন্দর, উজ্জ্বল। লুব্ধ হচ্ছে শুক্তি। সে ওই দাগটার উপর সযত্নে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হয়তো মুখখানা

নামিয়ে একটা চুমু খেয়ে নিল, কেউ তা টের পেল না। পেল শুধু মিহির। সে ত্বরিতে চাইলো শুক্তির দিকে। মুগ্ধা শুক্তি নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবিটা ঠিক করে দিল।

মিহির বুঝলো, শুক্তি তাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে চাইছে। এতটা সে আশা করেনি। এত সহজে, এত অনায়াসে শুক্তিকে পাওয়া সম্ভব বলে মনেই করেনি মিহির। ব্যাপারটা কি ঘটে গেল অন্য কেউ জানলো না। সত্য ফিরে এল।

—শুক্তি। সত্য বোনকে ডাকলো, বললে—মিহিরকে বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিস?

—না দাদা। পরিচয় তো আছেই। বাবা তো ভালোভাবে চেনেন ওঁকে।

—তাহলেও অনেকদিন পরে এসেছে মিহির। পরিচয়টা নতুন করে হোক। আয় মিহির, বাবার সঙ্গে দেখা করবি।

—চল, তাঁকে প্রণাম করে আসি।

সত্য মিহিরকে নিয়ে দোতলায় উঠে এলো। সত্যর বাবা ডাঃ গোপেন রায় বসেছিলেন একটা চেয়ারে। সারাজীবন অধ্যাপনা করেছেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত। তবে অবসর তাঁর নেই। কতকগুলো পাঠ্যপুস্তকের লেখক তিনি—তারই সংস্কারের কাজে প্রায় লেগেই থাকেন। আজও একটু আগে একটা বই-এর প্রুফ দেখছিলেন তিনি।

সত্য নিয়ে এলো মিহিরকে ওঁর ঘরে। মিহির ওঁকে প্রণাম করতে ডাঃ রায় বললেন,

—তোমাকে দেখেছি তো! কি যেন নাম তোমার?

—মিহির!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিহির। এখন কি করছ?

—প্রফেসারি আর টিউসনি করি।

—কোন্ কলেজে?

মিহির কলেজের নাম বললো। ডাঃ রায় আবার বললেন,

—'বাংলার রূপকথা' বইটা কি তোমার লেখা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পড়েছেন কি?

—না। পড়বার সুযোগ এখনও হয় নি। নাম শুনেছি। বইখানি নাকি ভালো হয়েছে।

—আমি কালই একখানা এনে দেব। একবার চোখ বুলিয়ে দেবেন দয়া করে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, দেব। সময় আমার খুব কম, তবু নিশ্চয় দেখব। বসো।

—আজ্ঞে না, আজ আর বসব না, অনেকক্ষণ এসেছি। নীচে ছিলাম। সেইখানেই চা খেলাম। এবার বাড়ি যাব।

—আচ্ছা। এবার এসো। আর হ্যাঁ, বিয়ে করেছ?

—আজ্ঞে না। এখনও অবসর পাইনি।

—এবার কর। আর দেরি করা ঠিক নয়। ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হবে। আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখি!

মিহির আবার প্রণাম করলো এবং বিদায় নিল। সত্য সঙ্গে আছে। নীচে আসবে, সত্যর মা এসে পড়লেন। মিহির তাঁকেও প্রণাম করলো। মা বললেন,

—তুমি অনেকদিন আসো নি মিহির! কেন বাবা?

—সত্য বিলেতে ছিল, তাই আসিনি মাসীমা।

—তাতে কি! আমরা তো ছিলাম। আবার কবে আসবে বাবা?

—আসবো। হয়তো কালই আসবো।

উত্তর দিতে দিতেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো মিহির। কারণ, ওর মনে চিন্তার বান ডেকেছে। শুক্তিকে তার হাতে দেবার জন্যে এই বাড়ির সকলের অসীম আগ্রহ এবং স্বয়ং শুক্তির সম্মতি ওকে নিদারুণ চিন্তায় ফেলেছে। এখন কি করবে? কোন পথে এগোবে? চিনি, না শুক্তি? চিনিকে কি বঞ্চিত করা হবে না? এতখানি বঞ্চনা হয়তো অসুস্থ চিনি সহ্য করতে পারবে না। মিহিরের মানবত্ববোধ দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে।

পথে নেমেই মিহির একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লো। চা সে অল্পক্ষণ আগেই খেয়েছে। এখন দরকার নেই। তবু সে ঢুকলো। একখানা চেয়ারে এসে বসলো। বয় এসে বললো,

—কি দেব?

—চা। না-না, কফি। উঁহু, কোকো এককাপ। না.....

বয়টা বিস্মিত হয়ে মিহিরের মুখের দিকে চেয়ে আছে। চিন্তিত মিহির বললো,

—যা হোক কিছু দাও। কফি আর কিছু চাট! মানে; চপ আর কাটলেট।

বয়টা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এনে দিল তার বরাদ্দ খাদ্য। মিহির আস্তে আস্তে খাচ্ছে, আর ভাবছে কি করা যায়? এই দুর্জয় প্রলোভন সে এড়াবে কি করে? শুক্তি কেবল শুক্তিই আসবে না, বেশ কিছু মুক্তো অর্থাৎ সম্পদত্ত আনবে। তাই ইঙ্গিত দিয়েছেন ওঁরা। কিন্তু সম্পদ না-হয় নাই এলো।

শুক্তি নিজেই এত অতুলনীয় সম্পদ। না, এত সম্পদ রাখবার জায়গা নেই মিহিরের বাড়িতে। তার ছোট্ট ফ্ল্যাটে এত বেশি সম্পদ ধরবে না। তবে শুক্তির সঙ্গে হয়তো একটা বাড়ি আসবে—গাড়ি তো আসবেই। তবু মিহির কেন এত ভাবছে?

খোঁড়া, অকর্মণ্য চিনি, আর সোসাইটির সেরা মেয়ে শুক্তি। আকাশ-জমিন ফারাক। এই স্বয়মাগতাকে নিশ্চয় স্বাগত জানাবে মিহির। জানানোই তো উচিত তার। ভাগ্য যখন আসে, তখন তাকে আসতে দিতে হয়, নইলে ভাগ্যদেবী বিরূপ হন।

মিহিরের সৌভাগ্য আপনিই আসছে। একে কি অবহেলা করা ঠিক হবে? না, কখনও না।

চিনির ব্যবস্থা তার বাবাই করবেন। যা হোক কিছু করবেন। চিনিকে কি কাজে দেবেন কে জানে? কে জানে, চিনি তার অতবড় জীবনটা কেমন করে কাটাবে। জেনে তার কি দরকার? চিনির উপর প্রেম তো কিছুমাত্র নেই মিহিরের। যেটা আছে সেটা নিছক সহানুভূতি, করুণা মাত্র। ওর মূল্য নিশ্চয় কিছু আছে, যেমন কাগজের নোট, বিদেশে যা চলে না।

মিহির উঠে পড়লো। এটা একটা বড় রেস্টুরেন্ট। বহু লোক খাচ্ছেন। নারী-পুরুষ—সুসজ্জিত তরুণ-তরুণী। সেতো অনতিবিলম্বে নিয়ে আসবে শুক্তিকে এখানে। ভাবতে আনন্দ হচ্ছে।

আজ রবিবার। হয়তো মিহির আসবে, এই আশায় চিনি অপেক্ষা করছে। অন্তরের কোনো এক অজ্ঞাত কন্দরে একটা আনন্দ-নির্ঝর যেন মুখ খুলেছে। তারই কলকাকলি শোনা যায় গানের মত। গভীর গোপন এই অনুভূতি সম্পূর্ণ নতুন চিনির কাছে। পরিপাটি সাজসজ্জা করবার মতো সুদেহধারিণী

নয় সে। তবু ঝি-র সাহায্যে নিজেকে যথাসম্ভব সুন্দর করে সাজালো। দেখলো, একটা বড় আয়নায় তার প্রতিবিম্ব—খুশীই হলো নিজেকে দেখে।

না, মিহির এলো না। পাঁচটা বাজলো, বাজলো ছ'টা-সাতটা। না, মিহির এলো না। নৈরাশ্যতা অগ্রাহ্য করে চিনি ভাবছে, হয়তো কোনও কাজে আটকে গেছেন উনি। হয়তো শরীর ভাল নেই, হয়তো-বা আমার জন্যে গেছেন কোন ডাক্তারের কাছে। তাছাড়া আর কি হ'তে পারে। অন্য আর কিছু নয়, মিহির তো কথাই দিয়েছে তাকে।

মিহিরদা আসবে, দিদির সঙ্গে কথা কইবে। তাই মিনি বা হিরণ কেউ ওপরে আসেনি আজ। কোথায় তারা? চিনি ঝিকে বললো,

—হিরণ কোথায় মানদা?

—কি জানি। খেলতে গেছে হয়তো!

—মিনি?

—ছোটদি মামার বাড়ি গেছে। মাও সঙ্গে গেছেন।

—তাহলে হিরণও হয়তো মামার বাড়ি যাবে।

—হ্যাঁ। ওখানে মামাতো ভাইয়ের ছেলের ভাত। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া।

—বাবা কোথায়?

—তিনি ফিরে আবার কোথায় বেরিয়েছেন। হয়তো তিনিও গেছেন।

বাড়িটা তাই এতখানি নির্জীব। চিনি আর কোন প্রশ্ন করলো না। করতে ইচ্ছে করলো না তার। কেমন একটা ক্লান্তিতে অসুস্থ হয়ে উঠেছে তার দেহ মন। অবসাদের অবসন্নতা ওকে ঘিরে ধরেছে। সাজ-পোশাক যতটুকু করেছিল, সব খুলে ফেলে চিনি শুয়ে পড়লো। রাত তখন ন'টা। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কলধ্বনি শুনলো মিনি আর হিরণের। তারা ফিরে এসেছে! ভাই-বোনে ছাদে এসে ডাকলো চিনিকে।

—দিদি, ও দিদিভাই, ওঠ। তোর জন্যে খাবার এনেছি।

—খাবার?

—হ্যাঁ, মামাবাবু পাঠালেন। ওঠ, খেয়ে নে।

—আমার কিছু খেতে ইচ্ছে নেই মিনি।

—তা হবে না। আমরা খেয়েছি, আর তুই খাবি নে! এ হয় না।

—তবে আন।

ইচ্ছে না থাকলেও চিনি খেতে বসলো। কারণ, মিনি আর হিরণ তাকে অত্যন্ত ভালবাসে। না খেলে ওরা ক্ষুণ্ণ হবে। তাই খেতে হলো। মিনি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো,

—মিহিরদা এসেছিলেন দিদি?

—না।

—আসেননি! কেন রে?

—কি জানি?

—কিন্তু আমাকে কাল ফোনে বলেছিলেন আসবেন।

—হয়তো কোনো কাজে আটকে পড়েছেন।

—কি জানি! মিনি একটু থেমে বললো—ডাঃ সত্য রায় ওঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

—তাতে কি হয়েছে? আমার অসুখের ব্যাপার নিয়ে হয়তো কোনো আলোচনা করবেন?

—ও খুব সোজা-সরল লোক দিদি। তাই না! তোর কোনও বুদ্ধি হলো না।

—না। হাসলো চিনি 'না' কথাটা বলে। ছোট বোন বলছে, 'তোর কোনো বুদ্ধি হলো না।' তাই হেসে প্রশ্ন করলো—তোর বুদ্ধিতে কি বলে?

—বলছি। হিরণ, তুই ঘুমোগে যা।

হিরণ চলে গেল। মিনি একটু ভাবলো। পরে বললো,

—মা চায়, ডাঃ সত্য রায় আমাকে বিয়ে করুক।

—ভালোই তো!

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি চাই না।

—কেন?

—ডাঃ সত্য রায় ভালো বর সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনদিন বনবে না।

—কেন? বনবে না কেন রে?

—ওর একটা বোন আছে, শুক্তি। খুব সুন্দরী মেয়ে। খুব নাম-করা সুন্দরী। গান গায়—নাচে। আর ছোঁড়াদের মাথা খেয়ে বেড়ায়। অবশ্য তারা ওদের সমাজের।

—সকলের সম্বন্ধে এমন খারাপ ধারণা কেন করিস মিনি? এ অন্যায়।

—করি, করতে বাধ্য হই। তুই কি জানিস বিছানায় পড়ে-পড়ে বই-পুঁথি ঘেঁটে এসব তথ্য জানা যায় না! ঐ শুক্তি সাংঘাতিক মেয়ে। ওকে যে বিয়ে করবে তার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

—তাতে তোর কি? কিন্তু সত্য রায় তো খারাপ লোক নন।

—কে জানে? ওরা খুব বড়লোক। অনেক টাকার মালিক। ঐ ছেলে, আর ঐ মেয়ে। বাবা বড় প্রফেসর—বৈজ্ঞানিক। ছেলে বিলেত-ফেরত ডাক্তার। বিলেত-আমেরিকাতেই ওদের ঘরবাড়ি হবার কথা। আমাদের দুর্ভাগ্য, ওরা ভারতে জন্মেছে।

—ওরা ঠিকই জন্মেছে মিনি। ডাঃ সত্য রায় ভাল পাত্র। যদি তিনি নেন তোকে, তো খুবই আনন্দের কথা।

—তোর মাথা আর মুন্ডু। ওরা কি মিহিরদা নাকি রে, আনন্দের কথা হবে?

—মিহিরদার ওপর তোর লোভ আছে মিনি? হাসছে চিনি।

—হ্যাঁ, ছিলই তো। কিন্তু তাতে কি? মিহিরদা তোকে ভালোবাসে, এই সত্যটা জানার সঙ্গে-সঙ্গে আমি ওকে ছেড়ে দিয়েছি। তোর জন্যে আমি এই স্যাক্রিফাইস করতে আনন্দ বোধ করছি দিদি। তোর জীবনে সোনার কাঠির স্পর্শ লাগুক—তুই মিহিরদার বুকে মাথা গুঁজে একান্ত নির্ভরতায় শুয়ে থাকবি। আমি তার শালী হব, বোন হয়ে যাব।

—মিনু! এতবড় ত্যাগ করেছিস তুই আমার জন্যে?

—হ্যাঁ। মিহিরদাকেও আমি বলেছি সে কথা। বলেছি, দিদিকে বিয়ে করুন আপনি। আমি আপনার বোন। আমাকে মা-বাবা এবং আপনি যোগ দেখে কোন পাত্রের হাতে দেবেন। আমি দিদির জন্যে আপনাকে ছেড়ে দিলাম।

—আমাকে নিয়ে কি যে তিনি করবেন, কে জানে? চিনির চোখে জল টলটল করছে।

—তুই ভাল হবি দিদি, নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবি। এ পর্যন্ত বাবা তোর জন্যে যে চিকিৎসা করিয়েছেন তা যথেষ্ট নয়। ইচ্ছে সত্ত্বেও বাবা কিছু করতে পারছেন না। মা খুব বাধা দেয়। বলে, ওর জন্যে আর কত খরচ করবে?

বিস্তর টাকা তো খরচ করলে ঐ ইন্‌ভযালিডটার জন্যে। বাবা মা'র কথা শোনেন, আর কাঁদেন।

—মা'র নিন্দে করিসনে মিনু।

—নিন্দে কিসের? যা বলছি সবই সত্যি। মা মিহিরদাকে ছাড়তো না, আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতই। আমি রাজী হলাম না, সেটা মিহিরদাকেও জানিয়ে দিলাম। অবশ্য মিহিরদা তোকে চাইলো, তাই দিলাম।

—যথেষ্ট তুই করেছিস মিনি আমার জন্যে। যা, এখন শুতে যা।

মিনি উঠে যেতে-যেতে আবার বসলো। বললো,

—ডাঃ সত্য রায়ের বাড়িতে তার বোনের সঙ্গে মিহিরদার দেখা হওয়াটা আমি পছন্দ করছিনে দিদি।

—তা, তুই কি আর করতে পারিস? ওদের তো আগেও পরিচয় ছিল।

—ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা শুক্তি যখন ছোট ছিল। এখন সে ঝলমলে শুক্তি। তবে ফোঁপরা-ফাঁপা—ওর মধ্যে মুক্তো নেই।

—মিনি, মানুষকে তুই বড় বেশী খারাপ ভাবিস। ছিঃ!

—তুই কি করে জানবি দিদি! পুঁথিতে এসব লেখে না। মানুষ খারাপ, স্বভাবতই খারাপ। ভালো হয়ে যায় কেউ কেউ—সেইটাই স্বভাবের বিকৃতি। খারাপ হওয়াটাই মানুষের স্বভাব।

—যাঃ! যতসব বাজে কথা। মুনি-ঋষি-যোগী-সিদ্ধসাধক সবাই খারাপ? সব মানুষই জঘন্য—না, তা মোটেই নয়।

—মুনি-ঋষির যুগ নেই এখন, দিদি! এ অ-মুনি-ঋষির যুগ। এরা ঋষি হয় না—রাসভ হয়, মুনি হয় না—মাতাল হয়, যোগী হয় না—যৌন-ক্ষুধায় পীড়িত চুল-দাড়িওয়ালা ভন্ড হয়।

—আচ্ছা, যা-হয় হোক্ গে! তুই এখন যা—শো গিয়ে। আর না যাবি তো শুয়ে পড় আমার কাছেই।

—সেই ভাল। নীচে আর যাব না।

মিনি চিনির পাশেই শুয়ে পড়লো। এমনি সে মাঝে-মাঝে থাকে। রমলাও জানে! কিছু বলতে গেলে তেড়ে আসবে মিনি। হাজার কথা শুনিয়ে দেবে মাকে। দিদিকে সে ভালোবাসে। তার কাছে শুয়ে থাকবে, কি বলার আছে? অক্ষম-অথর্ব দিদি তার! আদর, ভালোবাসা না পেলে সে বাঁচবে কি করে?

মিনির মতো স্পষ্ট। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী আর প্রাক্‌টিকাল মেয়ে। স্বপ্ন ওর নেই। কাব্য ও করে না জীবনকে নিয়ে। ডাঃ সত্য রায়কে ওর নানা কারণে অপছন্দ। সব থেকে বড় কারণ, সত্য রায়ের চরিত্র সম্বন্ধে তার অনেক খারাপ কথা জানা আছে।

শুক্তি সম্বন্ধে সব চিন্তাই শেষ করেছে মিহির। এখন তাকে বিয়ে করে ঘরে তোলাই বাকি! কথা অবশ্য আর অগ্রসর হয়নি। তবে কথা তো হয়েই আছে।

অকস্মাৎ কেন, কে জানে, চিনির কথা মনে পড়লো তার! কাল রবিবার ছিল। যাবার কথাও ছিল চিনির কাছে। যাওয়া হয়নি, অন্যায় হয়ে গেছে। না, অন্যায় কিসের? যেতে পারেনি, তার আর কি করার আছে? তবু জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তার। চিনি হয়তো অপেক্ষা করেছিল তার জন্য। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ছিল অপেক্ষা করে। ওখানে যাওয়া কমিয়ে দিতে হবে। যাবার কিইবা দরকার আর? না গেলেই ভালো।

আজই বিমলবাবুকে জানিয়ে দেবে মিহির যে, বিশেষ একটা কাজের চাপ পড়ায় সে এখন দু'চারদিন যেতে পারবে না। এই সংবাদটা যেন চিনিকে দেওয়া হয়। কিন্তু এর জন্য বিমলবাবুকে কেন? ফোন করে মিনিকে জানিয়ে দিলেই হবে।

মিহির বেরুলো তার নবপ্রকাশিত বইখানা নিয়ে। শুক্তির বাবাকে দেবে। পরিপাটি করে গোপেনবাবুর নামটা লিখেছে। একবার দেখলো, ভুল-ত্রুটি কিছু আছে কিনা লেখাটায়। না, ভুল নেই। সকালেই গেল মিহির। দুপুরে কলেজ আছে।

পথে একটা দোকানে ঢুকে নগদ পয়সা দিয়ে ফোন করলো বিমলবাবুর বাড়িতে। মিনিই ধরলো ফোনটা,

—হ্যালো! কে?

—আমি মিহির। খুব জরুরী একটা কাজ পড়ে যাওয়ায় কাল তোমাদের ওখানে যেতে পারিনি, মিনু। কিছু মনে করো না।

—কাল দিদি অনেক রাত অবধি অপেক্ষা করেছিল আপনার জন্য। আজ আসবেন তো?

—না। আজও যেতে পারবো না। কাজটা শেষ হতে দেরী হবে।

—ধ্যেৎ! কী এমন কাজ আপনার স্যার? যতসব বাজে কথা।

—বিশ্বাস কর, কলেজের একটা জরুরী কাজ পড়েছে আমার ঘাড়ে।

—বেশ, কবে আসবেন, বলুন।

—এই কাজটা শেষ করেই যাব। দিন-সাত তো লাগবেই।

—সা-ত-দি-ন। আপনাকে তাহলে হারালাম নাকি আমরা।

—ও-সব কি বলছ মিনু?

—অনেক দুঃখেই বলছি, স্যার। যখন আপনার অবকাশ হবে আসবেন।

—তুমি খুব চটেছ দেখছি!

—না স্যার, চটিনি। একটা গান মনে পড়লো।

—কি গান?

—শুনবেন? আচ্ছা, দিদির তরফ থেকে আমি শুনিয়ে দিচ্ছি শুনুন—

মিনি মিনিটখানেক নীরব থেকে তৈরী হয়ে নিল মনে মনে। তারপর ফোনেই গাইতে আরম্ভ করলো ঃ

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও—
আমি চিরদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিও।

—শুনলেন? এটা দিদির কথা—কবিগুরু লিখেছেন।

—হ্যাঁ। এখন একটু ব্যস্ত আছি! প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, শীগগির গিয়ে সব গানটা শুনব।

—আচ্ছা স্যার, ধন্যবাদ। প্রাতঃ প্রণাম।

মিনি আগেই ফোন ছেড়ে দিল। কেমন যেন রাগ হচ্ছে তার। ফোনের সামনের চেয়ারটায় গোঁজ হয়ে বসে রইল মিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে।

নীচে থেকে রমলা ডাকলো,

মিনি, চা খাবি আয়।

—এখানে পাঠিয়ে দাও।

মিনি উঠলো না। প্রায় আধঘন্টা পরে মিহিরের কলেজে ফোন করলো। কলেজ সকালবেলা বন্ধ। দারোয়ান ধরলো,

—হ্যালো, কি চাই?

—ওখানে কি প্রফেসর রায়—মানে, মিহির রায় রয়েছেন?

—আজ্ঞে না। এখন তো কলেজ বন্ধ—দশটায় খুলবে।

—আচ্ছা।

ফোন ছেড়ে দিল মিনি। আরো দশ মিনিট পরে ডায়াল ঘুরিয়ে ডাকলে ডাঃ সত্য রায়ের বাবাকে।

—হ্যালো! কে?

—আমি একজন ছাত্রী, স্যার। নাম মঞ্জুশ্রী পুরকায়স্থ। ওখানে কি আমাদের কলেজের প্রফেসর মিহির রায় আছেন?

—মিহির তো ছিল! একটু ধর, দেখি সে আছে কিনা?

—মিনি ধরে রইলো ফোন। মিনিট দুই পরে মিহির এসে ফোন ধরলো। বললো,

—হ্যালো! কে?

—আমি শ্রীমতি মিনি।

—ও! মিনু? কি খবর?

—খবর কিছু নেই, স্যার। আপনার জরুরী কাজটা কোথায় তাই জানলাম। একটু থেমে মিনিই আবার বললো—আচ্ছা স্যার, আপনাকে বিরক্ত করলাম। মাফ করবেন—নমস্কার।

মিহির চুপ করে আছে। মিনি ফোন ছেড়ে দিল। রাগে, দুঃখে তার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। যা সে আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটেছে। এখন দিদিকে কি বলা যাবে? আহা! বেচারা দিদি তার! কত আশা নিয়ে কাল সে অপেক্ষা করছে দীর্ঘক্ষণ। দিদি এই আঘাত সামলাবে কি করে? কেন এই আশা দিল মিহির তাকে? কেন? কেন? এ একটা ক্রিমিন্যাল।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে মিনি 'ক্রিমিন্যাল' কথাটা উচ্চারণ করলো। ওর মা শুনতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে শুধালো,

—কাকে কি বলছিস মিনি?

—তোমাকে....তোমাকেই বলছি ক্রিমিন্যাল।

—কারণ?

—কারণ তুমি আমাদের মা হবার যোগ্য নও। অন্যায়ভাবে তুমি আমাদের মা হয়েছ। তোমার শাস্তি হওয়া উচিত।

—যা, নালিশ করগে।

—হ্যাঁ করবো। তোমার নামে নালিশই করতে হবে।

—আমার অপরাধটা কোথায়?

—তুমি আমাকে, হিরণকে আর দিদিকে সমানভাবে ভালবাসতে পারনি, এই তোমার অপরাধ।

—কিসে প্রমাণ হয় রে?

—বিস্তর, অসংখ্য প্রমাণ আছে তার। দিদির ওপর তোমার ভালবাসা মেকি—ঝুটা! তুমি কি মনে কর দিদি আমাদের ফেল্‌না? নাকি খেলনা?

—এসব কি বলছিস মিনু! লোকে শুনলে বলবে কি? তোর দিদির বিয়ে হবে, তার জন্যে যা-কিছু করা সম্ভব সবই করা হবে।

—কিছু করা হবে না। দিদির বিয়ে হবে না।

—হবে না?

—না। দৃঢ়কণ্ঠে বললো মিনি—দেবো না দিদির বিয়ে। দিদি আমাদের দিদি হয়েই ঘরে থাকবে। আমরা তিন ভাই-বোন সমান অংশে ভাগ করে নেব বাবার যা-কিছু আছে। বাবাকেই আমি বলবো সে-কথা।

—বেশ তো! তাই নিবি। আমার ওপর অযথা দোষ চাপাস কেন?

—চাপাই কেন, তুমি দোষী তাই।

—আমি দোষী?

—হ্যাঁ। তোমার আপত্তিতেই বাবা ইচ্ছামত দিদির চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ করতে পারেন নি। তুমি দিদির জন্য টাকা খরচ করতে নারাজ। তুমি মা হতে পারলে না মা—তুমি সৎমা।

চলে গেল মিনি। তার যতটা রাগ মিহিরের উপর ছিল, সবটাই ঝেড়ে দিয়ে গেল মা রমলার উপর। রমলা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে জানে, এরা ভাই-বোনে দিদিকে কি চোখে দেখে। সে ভালোবাসার এতই গভীর যে, নিজের মাকে 'সৎমা' বলতে বাধলো না! তবে এটাও বুঝলো রমলা, মিনির এই রাগের কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোথাও হয়তো এমন কিছু ঘটেছে, যার জন্য মিনির এই ক্রুদ্ধ-মূর্তি। কিন্তু কি সেটা?

দেখলো, মিনি উপরে চিনির কাছে গেল না। তার পড়ার ঘরে বসলো গিয়ে। খবরের কাগজটা নিয়ে পড়ছে। রমলা তখন আর কিছু বললো না।

তবে বলবে, জিজ্ঞেস করবে মিনিকে। মিনির পিঠের উপর ভিজে চুলগুলো পড়ে আছে। রমলা বললো,

—যা, ছাদে গিয়ে চুলগুলো শুকিয়ে আয়।

—না। ছাদে যাব না। ও-বাড়ির ঐ ছেলেটা বড্ড তাকায় আমার দিকে।

—কে? কোন ছেলেটা?

—ঐ যে আন্নাকালীর ভাই গন্নাকাটা—সেই বজ্জাত ছোঁড়াটা আবার কে?

—ও, ঋত্বিক! গন্নাকাটা হবে কেন? বেশ তো সুন্দর চেহারা তার।

—আহা! কিবা রূপ! ময়ূর একটা ওকে কিনে দিতে হবে—কার্তিক হয়ে যাবে।

—ওর মা আমার কাছে প্রস্তাব করেছিল তোর জন্য।

—ওর মুখে মুড়ো ঝাঁটা মারতেও ঘেন্না করে আমার!

—ঘেন্না তোর সবাইকেই করে। মিহিরের মত ছেলেকেও....

—মিহির! রাম বলো। রাম-রাম-রাম। মিহির মানে যদি সূর্য হয় তো জান মা, আমি সূর্যকে বলছি, তিনি ঐ নাম পরিত্যাগ করুন।

চলে গেল মিনি। এতক্ষণে রমলা বুঝলো ব্যাপারটা তাহলে মিহিরকে নিয়েই। তবে কি ব্যাপার কে জানে? মিনি চট্ করে ভাঙবে না। মিহির কাল আসে নি। মত বদলালো নাকি। হঠাৎ রমলার মনে পড়ে গেল ডাঃ সত্য রায়ের বোন শুক্তিকে। শুক্তি সকলের চেনা। কে জানে, কিছু অঘটন ঘটলো কিনা সেখানে।

ফোনে শুনিয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান। দিদির তরফ থেকে শোনাচ্ছি বলেছিল মিনি এবং করুণ আবেদনও জানিয়েছিল। তবু যায় নি মিহির সেখানে। রবি-সোম-মঙ্গলবার কাটালো, কিন্তু যাওয়া হয়নি। না যাওয়াটা যে অন্যায়, অপরাধ হচ্ছে, এ সত্য আজ আর বুঝতে চায় না মিহিরের মন। ওখানে আর না-যাওয়াই মঙ্গল তার পক্ষে। চিনি শীঘ্র না হোক, বিলম্বে তাকে ভুলে যাবে। মানুষ চিরদিন এসব মনে রাখে না। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, আর সেটাই তার পক্ষে মঙ্গলকর। অতএব আর সেখানে যাবে না মিহির।

কথাগুলো ভাবছিল মিহির সকালে চা খেতে-খেতে। হিসেব করে দেখলো,

চার-পাঁচদিন সে যায় নি চিনিকে দেখতে, বা তার সঙ্গে কোন কথা বলতে। অথচ পাকা কথা সে দিয়ে এসেছে বিয়ে করবার। ব্যাপারটা মানবিক দিক দিয়ে যতটা কুৎসিতই হোক, কেউ জানবে না। কিন্তু এর একটা সামাজিক দিকও আছে যা চোখ এড়িয়ে যাবে না। বিশেষতঃ রমলা আর বিমলের চোখ এবং মিনি, তাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।

কলেজে কাজ আছে, এই মিথ্যা কথা বলে বেশীদিন আত্মরক্ষা করা যাবে না এবং মিনির মত মেয়ের পক্ষে তার কলেজে খোঁজ নেওয়াও কঠিন কিছু নয়। হয়তো এর মধ্যেই মিনি সেটা করেছে তলে তলে এবং মিহিরকে একটি আস্ত শয়তান ভেবে আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি।

পুরুষের মনের একটা স্বাভাবিক ধারনাই হচ্ছে, সে কোন নারীর মনে শয়তানরূপে প্রতিভাত হতে চায় না। যে কোন পুরুষ প্রতিটি নারীর অন্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় দেবতার আসনে। প্রতিটি পুরুষের এই অনুভব বোধ আছে বলেই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আজও কিছুটা দেবত্ব না হোক, মানবত্ব দেখা যায়। নইলে, পুরুষ জাতি এতদিনে পৃথিবীকে নরকে পরিণত করতো। নারীর অন্তরে নিজেকে উদার-মহানরূপে, শান্ত-শুদ্ধ বৃদ্ধরূপে—অন্ততঃ সাধারণ সংসারী পত্নী-পুত্র-প্রতিপালকরূপে প্রতিভাত হতে চায়। কোন নারীর চোখে নিজেকে হীন, নীচ এবং অনুদার রূপে দেখাতে চায় না সে। মিহিরও চাইল না। হয়তো আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করতো মিহির। তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো। এই বাড়ির মালিক দিবাকরবাবুর চাকর এসে জানাল,

—আপনাকে ফোনে কে ডাকছেন।

—ও, আচ্ছা, যাচ্ছি।

উঠলো মিহির। নিজের ফোন না থাকায় দিবাকরবাবুর ফোন-নম্বরটা সে দিয়েছিল শুক্তিকে। তাহলে শুক্তিই ডাকছে।

—হ্যালো, কে?

—আমি শুক্তি।

—ও, কি খবর?

—খবর! আজ বিকেলে আপনার সঙ্গে যে এন্‌এগজমেন্ট আছে সেটা বাতিল করতে হলো।

—কেন? হঠাৎ কি হলো?

—হঠাৎ নয়, আমার মনে ছিল না। আজ আমাদের প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলন। আমাকে সেখানে গাইতে হবে। চারটে-পাঁচটায় বেরিয়ে যাব ফিরবো রাত্রে। আশা করি, আপনি আমার এই বিস্মরণের জন্য কিছু মনে করবেন না।

—না-না, মনে করবার কি আছে? বেশ, বোটানিক বাগানে তাহলে যাচ্ছেন কবে?

—কাল যদি না-হয়, তো পরশু।

—সে খবর কখন পাব?

—কাল ফোনে জানিয়ে দেব। আচ্ছা, নমস্কার। ফোনটা ছেড়ে দিল শুক্তি।

মিহির বুঝলো, ওখানে যেন আরও কারা রয়েছেন। তাঁরা জোর তাগাদা দিচ্ছেন শুক্তিকে ফোনে কথা শেষ করতে। তাই অমন আকস্মিকভাবে ফোনটা ছেড়ে দিল শুক্তি।

মিহির ফোনে শুক্তির কথা শুনে খুবই আহত হলো।

আহত হবারই কথা। তবে, ওখানে হয়তো আরও বেশী জরুরী দরকার কিছু আছে তাই শুক্তি এমন করলো; ভেবে মিহির নিজেকে সান্ত্বনা দিল। তবু যেন তার মন পীড়িত হচ্ছে। সে আরও ভাবলো, শুক্তি তাদের প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলনের সভায় তো মিহিরকেও নিয়ে যেতে পারতো। পরমুহূর্তে আবার ভাবলো, হয়তো শুধু ছাত্রীরাই সেই সম্মেলনে থাকবে, পুরুষের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ।

কিন্তু এ যুগে এ রকম তো হয় না। সর্বত্রই নারী-পুরুষ আজ মিলেমিশে কাজ করছে। কিন্তু কোথায় এই ছাত্রী-সম্মেলন। খবরটা তো বললো না শুক্তি। তবে মিহির জানে, শুক্তি কোন্ কলেজে পড়েছে! জানে, যখন সত্য আর সে বন্ধুত্ব পালিয়েছিল তখন থেকে। শুক্তি ছিল তখন অনেক ছোট। লেডি ব্রাবোনে পড়তো শুক্তি।

দিবাকরবাবু ছাপাখানার ব্যবসা করেন। অমায়িক ভদ্রলোক, ছোট্ট পরিবার—সংখ্যায় মাত্র চারজন। স্বামী-স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলের নাম অঞ্জন, আর মেয়ের নাম খঞ্জনা, অথবা খঞ্জনী। ছেলে পঁচিশে পড়েছে। মেয়ের বয়স হলো কুড়ি।

ছেলেমেয়ে নামে এই রকম 'ঞ্জ'-প্রীতি দিবাকরবাবুর, আর পত্নী রঞ্জিতা দেবীর। নিজের 'ঞ্জ' অক্ষরটা তিনি ছেলে আর মেয়ের নামে জুড়েছেন এবং

স্বামীকে আদেশ করেছেন,

—প্রেসের টাইপ 'ঞ্জ' যেন বেশী থাকে। কারণ, ঐ 'ঞ্জ'-টাই আমার 'লাক' মানে ভাগ্য।

—কেন? ঐটাই তোমার 'লাক' কেন? দিবাকরবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন।

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমতী রঞ্জিতা জানিয়ে ছিলেন,

—গৃহদেবতা শ্রীশ্রীকরঞ্জাক্ষ শিবের পূজো দিয়ে ছাপাখানা খুলে 'লাক' খুলেছে। ঐ শিবের নামের বিশেষত্ব 'ঞ্জ'।

কথাটা শুনে হেসেছিলেন দিবাকরবাবু। বলেছিলেন,

—তাহলে আমার নামেও একটা 'ঞ্জ' লাগিয়ে দাও।

—না, তা হয় না! আমার ছেলেমেয়ের নামে দিয়েছি—বৌ-এর নামেও থাকবে 'ঞ্জ'। আরও বলেছিলেন।

—হ্যাঁ, অবশ্যই থাকতে হবে তার নামে 'ঞ্জ'। আমরা তো 'ভঞ্জ' উপাধিকারী। তোমার নামে 'ঞ্জ' আছে। দিবাকর ভঞ্জ। এখন অঞ্জনা-মঞ্জুলা নামের মেয়ে চাই আমার বৌমার জন্য। খোঁজ কর এখন ঐ নামের মেয়ে।

হাসিটা সামলে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন দিবাকরবাবু। বলেছিলেন,

—তুমি খোঁজ কর।

মিহির ফোন ছেড়ে দিবাকরবাবুর ঘরেই রয়েছে। হঠাৎ বললো,

—খঞ্জনার বিয়ের চেষ্টা করছেন তো? কোথাও ঠিক হলো নাকি?

—না। খঞ্জনা এখন বিয়ে করতে চায় না, আরো পড়তে চায়। পড়ুক। তবে এবার ছেলের বিয়ে দেব।

—আমার হাতে একটি ভালো মেয়ে আছে।

—কি রকম মেয়ে?

—খুব ভাল মেয়ে। আমার ছাত্রী।

—তাই নাকি! বেশ, বেশ। ওরে সাগর, তোর মাকে জলদি ডেকে দে তো। মিনিটখানেকের মধ্যেই রঞ্জিতা দেবী এসে বললেন,

—কি ব্যাপার?

মিহির বলছে, ওর এক ছাত্রী আছে। খুব ভাল মেয়ে। অঞ্জুর জন্য

—কি নাম তার?

—মিনি....মৃন্ময়ী। খুব সুন্দরী, আর বুদ্ধিমতী—দেখবেন আপনারা?

—না! ও হবে না। ওর নামে 'ঞ্জ' নেই, সেই কারণে হবে না।

—কি ব্যাপার? 'ঞ্জ' চাই?

—হ্যাঁ। নামে 'ঞ্জ' দরকার, নইলে তুমিই তো একটা ভাল পাত্র। তোমার হাতে খঞ্জনাকে দিতে পারতাম। তোমার নামে 'ঞ্জ' নেই, তাই ওকথা তুলিনি।

—হা ভগবান! মা-বাবাকে গাল দিতে ইচ্ছে করছে কাকীমা। কেন যে তারা 'ঞ্জ' দিয়ে নাম আমার রাখেননি...

মিহির কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললো কথাগুলো। রঞ্জিতা দেবী তাকে বললেন,

—তা হোক! তুমি খুব ভাল ছেলে। তোমার বৌ ভাল হোক—ভালই হবে। খঞ্জনা বলছিল, ঐ বিমলবাবুর মেয়েকে নাকি তুমি বিয়ে করবে?

—না কাকীমা। আমি ওর কথাই তো বলছিলাম। ওরই নাম মিনি।

—ও হবে না। আমার জামাই-এর নামে 'ঞ্জ' চাই—বৌ-এর নামে তো চাই-ই।

—নাম নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন করছেন কাকীমা?

—বাড়াবাড়ি কিসের? 'ঞ্জ' হচ্ছে 'লাক্'! ও আমার চাই-ই। ও-ছাড়া আমার চলবে না।

চলে গেলেন রঞ্জিতা দেবী। মিহির দিবাকরবাবুকে জিজ্ঞেস করলো,

—এ কি রকম বাতিক কাকাবাবু?

—বাতিকের আবার রকম কি?

—হাসলেন দিবাকরবাবু। ইতিমধ্যে খঞ্জনা ঢুকলো ঘরে। মিহিরের কাছে এসে বললো,

—মিহিরদা, আমায় একটা সিলেবাস এনে দেবেন?

—হ্যাঁ, এনে দেব। কালই এনে দেব।

বাইরের বারান্দা দিয়ে ফিরছে মিহির। খঞ্জনা সঙ্গে আসতে আসতে বললে,

—মিনিকে নিলেন না আপনি?

—না। ওকে বোনের মত দেখি, যেমন দেখি তোকে।

—মিনি আমাকে বলেছিল, ওর সেই পঙ্গু বোন চিনিকে নাকি আপনি বিয়ে করতে চান। তাই মিনি আপনাকে ছেড়ে দিল। এ কি সত্যি মিহিরদা?

—হ্যাঁ। কিছুটা সত্যি। তবে চিনিকেও আমি নিতে পারলাম না খঞ্জনা। ও একেবারে অকেজো....

—হু! বেচারা খুবই আশা করেছিল আপনার কাছে। এখন হতাশ হয়ে যাবে খুব।

—ওটা সেন্টিমেন্ট! ভুলে যাবে অল্পদিনেই।

—সব ব্যাপার ভোলা যায় না মিহিরদা! যাক্ গে! আমার সিলেবাস এনে দেবেন কিন্তু কালই। কেমন?

—হ্যাঁ। নিশ্চয় আনব।

বলে, মিহির চলে এলো।

অপেক্ষা করে-করে চিনি এখন বুঝেছে, মিহির তাকে উপেক্ষা করলো, এড়িয়ে গেল! আশাহত চিনির চোখের জলটা সবে পড়েছে, মিনি এসে ধমকের সুরে বললো,

—খবরদার কাঁদবিনে।

—না! চোখ দুটো মুছলো চিনি। নিজেকে সামলাতে দেরী হচ্ছে তার।

মিনি দেখলো। বুঝলো যে, চিনির মনের অবস্থা করুণ থেকেও করুণ। দিদি তো চায় নি। কেন তাকে আশা দিল ঐ বর্বর শয়তানটা? দিদির মনটাকে এমন নির্মমভাবে পদদলিত করবার কি অধিকার আছে তার? অপেক্ষা করে-করে তার দিদি অসহায় হয়ে পড়েছে। মিনি ইনভ্যালিড চেয়ারটা ঠেলে বাইরে আনলো চিনিকে, খোলা আকাশের নীচে। অসীম নীল আকাশে পাখীরা উড়ছে। মিনি সেই দিকে তাকিয়ে বললো,

—ওরা কেমন উড়ছে দিদি। ওদের কোনও বন্ধন নেই। ওরা মুক্ত—ওরা স্বাধীন!

—সৃষ্টিতে কেউ স্বাধীন নেই মিনি। তবে ওদের জীবন অপেক্ষাকৃত ভাল। ওরা আশা করে না, তাই আঘাতও পায় না। আমি আহাম্মকের মত আশার ছলনায় পড়েছিলাম। যাক্‌গে, তুই ভাবিস নে। এ ভালই হলো। কিন্তু এর কারণটা জানতে ইচ্ছে হয় আমার।

—কারণ শুক্তি। সে ওকে হজম করে ফেলেছে!

—ভাল। সেখানেই তিনি ভাল থাকুন! আমি ওঁর ক্ষতি করতে যে পারলাম না, এর জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। এ খুব ভাল হলো মিনু।

—তোর মাথা হলো! তোর মুন্ডু হলো! তোর পিন্ডি হলো?

—কেন?

—জানিস, সোসাইটির কোন ছেলে ওকে বিয়ে করতে চায় না। অতএব অধ্যাপকের মেয়ে। অত অঢেল ধনসম্পত্তির মালিক ওরা। অমন সুন্দরী সঙ্গীতজ্ঞা, শিক্ষিতা, তাছাড়া বাক্‌পটু। সব রকমে হাই সোসাইটির যোগ্য মেয়ে শুক্তি। তবু মিহিরকে কেন ধরেছে জানিস?

—কেন? মিহির তো খুব ভাল পাত্র।

—হ্যাঁ, ভাল....আমাদের পাড়ায় ভাল, কিন্তু ওদের পাড়ায় নয়। ওখানে সব বিলেতী মরসুমী ফুল থাকে—গোলাপ—ডালিয়া—ক্রিসানথিয়াম, বুগেন ভিলিয়া; চম্পা, চামেলী, শিউলী, করবী, জবার দেশ নয়। বুঝলি!

—কিছুই বুঝলাম না।

মিহির ওখানে ভোমরা নয়, গুব্‌রে পোকা। তবু এরা মিহিরকে নিতে চায়। তার কারণ, শুক্তি এত বেশী বহির্মুখী মেয়ে, তোমরা পন্ডিতি ভাষায় যাকে "গোষ্ঠীযোজিকা" বল। ওর সঙ্গে যে যতই মেলামেশা করুক, বিয়ে কেউ করতে চায় না ওকে।

মিহির তাকেই বিয়ে করবে?

—করবে করুক। জীবনটা তার জ্বালাময় হোক। আমি দেখে খুশী হব।

—কিসব বলছিস মিনি? তোর উতি ওকে সতর্ক করে দেওয়া।

—না। তাহলে ও ভাববে আমাদের স্বার্থ আছে, তাই শুক্তির নামে আমি বদনাম দিচ্ছি। জানিস দিদি, বইয়ের পোকা তুই, তোর কোন জ্ঞান-বুদ্ধি হলো না এখনও। এই মোহ যার হয় অর্থাৎ যখন কোন পুরুষ মোহগ্রস্ত হয়, তখন কারও কথা সে শোনে না। যে বলতে যাবে, সেই আহাম্মক। এখন মিহিরকে কোন কথা বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। অনর্থক আমি তার বিরাগভাজন হব! কি আমার দায় পড়েছে? তুই শুধু দেখে যা।

—শুক্তি কি সত্যিই এই রকম মেয়ে?

—তোকে মিথ্যে বলে আমার লাভ কি দিদি? তোকে খুশী করতে, তোর জীবনটা সফল করতে আমি মিহিরকে নিলাম না। এ কথা তোকে বলেছি। এখন বুঝলাম মিহির একটা পাজী, হতভাগা। ওর বিদ্যে-বুদ্ধি-রূপ-গুণ সবই কলঙ্কিত মনে হচ্ছে। ওর নাম পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারছি না। তুই ওর জন্যে মন খারাপ করিসনে দিদি—দোহাই তোর। তোর বরাতে এটা ভালই

হয়েছে যে, ঐ রকম একটা নরপশুর হাতে তুই পড়লি নে, তুই বেঁচে গেছিস দিদি।

রাগে ঠোঁট কামড়াচ্ছে মিনি। ঠিক এই সময় কে এসে খবর দিল,

—মাষ্টার মশাই এসেছেন।

—কে, মিহিরবাবু?

—হ্যাঁ। উনি আসতে চান এখানে।

—আসুন। ডেকে দে ওঁকে।

কথাগুলো বললো চিনি। আধমিনিট পরেই এলো মিহির। কাছের টুলটা এগিয়ে দিতে দিতে মিনি বললো,

—সুপ্রভাত। না-না, সু সন্ধ্যা। বসুন স্যার। আমি দেখি যদি চা-টা কিছু যোগাড় করতে পারি।

মিনি চলে যাচ্ছে। মিহির তাড়াতাড়ি বললো,

—চা পরে হবে। শোন, কথা আছে। বসো একটু।

—কথা? আমার সঙ্গে? না, আমার সঙ্গে কোন কথা থাকতে পারে না।

—আছে। খঞ্জনীকে নিশ্চয়ই চেন তুমি?

—হ্যাঁ। ওর নামেই ও চেনা। আমি তো পড়েছি ওর সঙ্গে!

—ওর দাদার নাম অঞ্জন। জানো তো?

—জানি। ওর মার নাম রঞ্জিতা। সব ওরা 'ঞ্জ'—উপাধি 'ভঞ্জ'। তবে 'খঞ্জ'নের কেউ গঞ্জিকাও খায় না। শুনেছি, ওর বাবা দিবাকর ভঞ্জ নাকি নম্বর ওয়ান সতরঞ্জ ব্যক্তি।

—তার মানে?

—মানে, তিনি নাকি রাজা যুধিষ্ঠীরের সঙ্গে সতরঞ্জ অর্থাৎ পাশা খেলতেন।

—ও! ওসব রঙ্গরস এখন বাদ দাও মিনু।

—দিলাম, দিয়েছি। ক'দিনই হলো ছেড়ে দিয়েছি। তবে কি জানেন স্যার, স্বভাব যায় না মলে। যে রঙ্গরসের সম্পর্কটা পাতাবার কল্পনা করে স্যারের সঙ্গে শ্যালীকার ভাষাটা ব্যবহার করেছিলাম, তা বাদ দিলাম। এখন আদেশ করুন স্যার।

চেয়ে দেখলো মিহির, চোখ-মুখ কেমন যেন অশান্ত উগ্র হয়ে উঠেছে মিহির—নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। অপরাধীকে কঠোর দন্ড দেবার সময়ে হয়তো

বিচারপতিদের মুখও এত বেশী কঠিন হয় না। মুখে হাসি টেনে বললো, মিহির,

—বসো মিনু। তুমি অকারণ আমার ওপর চটে আছ।

—না। আপনার ওপর কেন আমি চটতে যাব? মাইনে করা মাষ্টার ছাড়া আর কি আপনি? আপনি কি আমার প্রিয়তম প্রাণেশ্বর, যে চটে যাব? কি কথা আছে বলুন?

—এতটা উত্তেজিত কেন হচ্ছিস মিনি? অকারণে অশান্তি করিস নে। উনি কি বলতে চান শোন।

—শুনবি তুই। আমি ওঁর প্রেমে পড়তে যাইনি যে আবোল-তাবোল শুনতে হবে। শুনুন স্যার, বাড়িতে এসেছেন, চা একটু খাবেন তো?

—মাইনে করা মাষ্টারের পক্ষে সেটা খুব বেশী ধৃষ্টতা হবে না কি?

—না। আজ আপনি শুধু অতিথি। পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে এবং আমাদের শিক্ষাগুরু হিসেবে আপনার আপ্যায়ন করা আমাদের কর্তব্য। অনুগ্রহ করে চা একটু খান। আনবো?

—আচ্ছা, আনো।

মিনি চলে গেল। মিহির যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছে মিনির কথায়। কিন্তু মিনিকে সে চেনে। মিনি চিনি নয়। সে হয়তো মিহিরের এ ক দিনের জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে জেনে ফেলেছে, যাতে মিহিরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা অসাধ্য নয় তার পক্ষে, এবং মিহিরও বুঝছে সে স্বয়ং অপরাধী। মিনি চলে গেল। মিহির আস্তে আস্তে বললে চিনিকে,

—কেমন আছ?

কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইছে চিনির দেহখানা। সে অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করে সযত্নে মুখে হাসি টেনে নিয়ে বললো,

—ভালই।

—আমি ক'দিন আসতে পারিনি জরুরী একটা কাজের জন্য।

—কাজটা শেষ হলো?

—না। আরো ক'দিন দেরী হবে।

—হোক। কোন পড়াশুনার ব্যাপার, নাকি থিসিস কিছু?

—ঐ রকমই কিছু একটা। পরে জানাব।

চিনি আর কিছু শুধালো না। মিনি চা নিয়ে এলো।

—শোন মিনু, অকারণ আমার ওপর রাগ করো না। তোমার জন্য একটি সুপাত্র....

—থাক, থাক। আমাকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করবেন না, স্যার। ও আমার হজম হবে না।

—ঘুষ?

—হ্যাঁ। আমাকে ঐ 'ভঞ্জ' পরিবার দেবার জন্য আপনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেছে, এ খবরও আমি জানি। জানিয়েছে ওদেরই মেয়ে খঞ্জনী।

—কি বলেছে সে?

—সে বলেছে, মা'র যে কি বাতিক বুঝি না। তোর নামে 'ঞ্জ' নেই বলে তোকে বৌ করবে না, মা। আর আপনি এই প্রস্তাবটুকু সম্বল করে সপ্তাহ খানেক এখানে না আসার লজ্জাটা ঢাকতে এসেছেন। ওটা ঘুষ ছাড়া আর কি? খান, চা খান। বোটানিক গার্ডেনে তো আপনার নিমন্ত্রণ হয় নি?

—তুমি তো দেখছি একটা সাংঘাতিক গোয়েন্দা! কোথায় পেলে এসব খবর?

—গোয়েন্দারা কিন্তু কোন সময় অত সহজে খবর ভাঙে না! তাদের কাজ গুপ্ত ভাবে করে যাওয়া।

—থাক ওসব কথা। তাহলে ওখানে বিয়ে করতে রাজী নও তুমি?

—ওর মা তো সটান জবাব দিয়েছেন। আবার ও-কথা কেন বলছেন?

—ওর বোন, বাবা, আর স্বয়ং অঞ্জনও চায় তোমাকে।

—ও-কথা থাক এখন, পরে আমি ভেবে বলব। নিন, চা খান। চলে গেল মিনি চায়ের ট্রে-টা রেখে।

চা খাওয়াচ্ছে চিনি। মিহির বললো চা খেতে-খেতে,

—ক'দিন আসতে পারিনি। আশা করি, তুমি আমার ওপর রাগ কর নি তো?

—না রাগ কেন করব? তবে, খুবই দুঃখ পেয়েছি। আসবেন কথা দিয়ে না এলে বড়ই নৈরাশ্য জাগে মনে।

তা ঠিক। মিনি আমার ওপর দারুণ রেগে আছে। ওকে ঠান্ডা করতে কিছু

ওষুধ জোগাড় করেছিলাম, কাজে লাগলো না দেখছি।

ওসব করবেন না। মিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে সব বোঝে।

—তাই তো দেখছি। পড়াশুনাতে খুব ধারালো না হলেও এদিকে তার বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। যাক, আমি জরুরী কাজটা শেষ করেই আসব। ভেব না তুমি।

—আচ্ছা, সেটা কবে নাগাদ শেষ হবে?

—একটু দেরী হতে পারে। এই ধর, মাসখানেক।

—এত বেশী।

—হ্যাঁ। কাজটা একটু জটিল। 'লোকসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে গবেষণা করছি। দূর পল্লী অঞ্চলে যেতে হচ্ছে। তুমি নিশ্চয় বুঝবে, কাজটা কত কঠিন?

—হ্যাঁ, তা সত্যি! এ বিষয়ে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না তো?

—নিশ্চয় পারবে। তবে আগে 'লোকসাহিত্য সংগ্রহ' করে আনি। আচ্ছা, আসি আজ!

মিহির যথারীতি বিদায় নিল। অর্থাৎ ভদ্রভাবেই চিনিকে একটু ছুঁয়ে আদর করে চলে গেল। আনন্দে বিহ্বল চিনির অন্তরটা অনাস্বাদিত মাধুর্যে ভরে উঠতে চাইছে। বেশ কিছুক্ষণ উপভোগ করলো সে এই আনন্দানুভূতি। ভাবতে লাগলো, মিহির নিশ্চয় তাকে বঞ্চিত করেনি, করবেও না। এতটা ভালবাসা কখনও মেকি হতে পারে না। মিনির ধারণা ভুল। চিনির একান্ত অক্ষমতা সত্ত্বেও মিহির তাকে গ্রহণ করবে, এতবড় সৌভাগ্য সইবে কি করে চিনি? ঈশ্বর যেন তার সহায় হন। চিনি মনে মনে বার বার ঈশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলো।

মিনি এলো অনেকক্ষণ পরে। এসে বললো,

—উনি কতক্ষণ গেছেন দিদি?

—প্রায় আধঘন্টা হলো।

—হুঁ।

মিনি বিরক্তির সুরে শুধু 'হুঁ' বলে চুপ করে রইল। পাশে রাখা যন্ত্রটার তারে টুটাং শব্দ করছে। চিনি প্রশ্ন করলো,

—কি ভাবছিস মিনু?

—ভাবছি, মানুষ কতরকম ছলনা করতে পারে? কত রকম ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে?

—মিহির কি ছলনা করছে। ছদ্মবেশ ধরেছে বলে তুই মনে করিস?

—হ্যাঁ করি। ওর অভিনয় পুরোপুরি জমতো যদি না থাকতাম। তুই অত্যন্ত সরল-মনা মেয়ে দিদি। পুরুষকে অত সহজে বিশ্বাস করতে নেই। বাইরের জগতের কোন অভিজ্ঞতা নেই তোর। তাই তোকে আমি সাবধান করতে চাই। মিহিরবাবুর আশা ছেড়ে দে তুই।

—ছেড়ে দেব? বিশ্বাস কর, আশা তো আমি কোনদিন করিনি মিনু।

—করেছিস। এখনো করে আছিস। এই আশাটা জাগিয়েছে তোর মধ্যে ঐ শয়তান মিহির। ও তার উদারতা আর মানবতা, আর সুমহান প্রেমের মহিমা দেখাতে চেয়েছিল তোকে বিয়ে করে! হয়তো বিয়ে তোকে করতো। কিন্তু হঠাৎ এই সত্য ডাক্তার আর তার বোন শুক্তি এসে গোল বাধাল। তোকে সে বিয়ে করবে না। নেহাৎ চক্ষুলজ্জাটা বাঁচাতে আজ এসেছিল। তাছাড়া এর আর একটা কারণ, শুক্তি আজ বাড়িতে নেই। সময়টা কাটাতে, আর তোকে আরও খানিকটা সান্ত্বনা দিতে সে এখানে এসেছিল। এই শয়তানটার আশা তুই ছেড়ে দে দিদি।

চিনি অবাক হয়ে ওর কথা শুনেছিল। বললো,

—তুই কি সত্যিই গুপ্তচর মিনি?

—হ্যাঁ তোর জন্যেই হতে হয়েছে। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক মিনি। 'বাংলার লোকসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা' নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখব, আজ সে তোকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেল! সে যে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখছে, যার নাম 'লোকসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা', তার জন্য সে নাকি পল্লী-অঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে সব উড়াদান সংগ্রহ করছে। মিথ্যুক কোথাকার!

—মিথ্যুক!

—হ্যাঁ, মিথ্যুক! দিবাকরবাবুর 'করঞ্জাক্ষ' ছাপখানায় একখানা বই ছাপা হচ্ছে। লেখক একজন অখ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি সারা বাংলা ঘুরে লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে ছাপাচ্ছেন ঐ প্রেসে। তোর ঐ বঞ্চক-প্রেমিক মিহির সেই বইটার প্রুফ দেখে। ফর্মা প্রতি দশ টাকা পায়। এমন মতলব করেছে, ওই প্রবন্ধ থেকেই একটা বড় ধরনের থিসিস লিখে ফেলবে।

—তা হয়তো ফেলবে।

—তাতে তোর কি? ‘বেল’ পাকলে কাকের কিছু এসে যায় না। ও তোকে বিয়ে করবে না।

—আমায় বিয়ে না করুক ও ভাল থাক্।

রুষ্টস্বরে মিনি বললো—থাকবে না, থাকতে পারে না। ঈশ্বর ওর ভাল করতে পারবে না।

—অভিশাপ দিচ্ছিস মিনি?

—হ্যাঁ দিচ্ছি, আরো দেব। আমার অসহায় দিদিকে যে এমন করে বঞ্চনা করে, তাকে আমি অভিশাপ দেব....দেব....দেব।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো মিনি। তারপর উঠে চলে গেল। চিনি ভাবতে লাগলো, মিনির কী অসীম ভালবাসা! আশ্চর্য এই প্রেম। দিদির জন্য কত বড় ত্যাগ সে করেছে। তবু দিদি তার সুখী হলো না, হতে পারছে না। এই দুর্ভাগ্যকে মিনি মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু মিহির কি সত্যিই প্রতারণা করছে চিনিকে? মিনি তো রীতিমত গুপ্তচর-বৃত্তি শুরু করেছে তার পিছনে। আর মিনির বাহাদুরী যে, সত্য খবর সে কিছু জেনেছে মিহির সম্বন্ধে। অনেকক্ষণ চিন্তা করে চিনি ঝিকে বললো মিনিকে ডেকে দিতে।

মিনি তক্ষুণি এলো। চিনি বললো,

—সেই লেখকের লোকসাহিত্যের বই একখানা কিনে আনবি কাল, দেখব।

—তুই লিখবি দিদি! লিখিস তো সেই লেখক ভদ্রলোকটিকে ডেকেও আনতে পারি। তাঁর সঙ্গে কথা বলবি।

—আচ্ছা, আগে তুই একখানা বই আন তো। দেখি কেমন বই!

রাত হয়েছে। চিনিকে খাবার দেওয়া হলো। খেল চিনি। মিনিও খেয়ে এসে দিদির কাছে শুয়ে পড়লো। বললো,

—তোকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, দিদি। আমিই তোকে বিয়ে করব!

—আচ্ছা, তাই করিস। বেশ থাকব দুই বোনে।

হাসলো চিনি। মিনিও হাসলো। যতটা সম্ভব চিনির মনকে হাল্কা করতে চায় মিনি। হিরণ এখন এসব মানসিক রসঃরহস্যের কোন খবর জানে না। পড়া আর লেখা নিয়েই মেতে আছে সে। অতএব তার কথার কোনও আলোচনা হয় নি ইতিপূর্বে। আজ হঠাৎ মিনি বললো,

—হিরণ বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করেছে দিদি। খুব আনরুলি হয়ে উঠেছে।

—কেন? কি হয়েছে? কি করেছে সে?

—নিত্যই করছে। নানা রকম আন্দোলনের পান্ডা সে কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের লীডার। বাবা তো খুব ভাবনায় পড়েছেন।

—ভাবনা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তারপর?

—কাল কলেজে পুলিশ ঢুকেছিল। কাঁদানে গ্যাস ছেড়েছে। হিরণের চোখে লেগেছিল। কে জানে কবে জেলে যাবে?

—আমাকে তো এসব কথা আগে বলিস নি?

—তোকে বলে কি লাভ? আজ হঠাৎ বলে ফেললাম।

—বল্‌লি কেন?

হিরণের জন্য মা-বাবা খুব ভাবছে তাই। ....একটিমাত্র ছেলে।

—তাই তো! ভাবনার কথাই। এইজন্যই বাবা ক'দিন আমাকে দেখতে আসতে পারেন নি।

—না, তা নয়। তোর জন্য বাবার মন সব সময় কাঁদে। বাবার এখন সময় খুব কম। 'ইয়ার-এন্ডিং' চলছে। তাছাড়া বাবা ভেবেছিলেন মিহির আসে, তুই ভাল আছিস। তাই বাবা আসেন না। কাল আমি বাবাকে বলে দেব যে মিহিরের কথা সব ফাঁকা। ও বঞ্চক, প্রতারক! ওর নাম করতে ঘেন্না হয়।

—তুই মিহিরকে এতটা নীচ ভাবছিস কেন, মিনি?

—সে যা, তাই বলছি। আমি তো তার প্রেমে পড়তে যাই নি! তোর মত রঙিন চোখে তাকে দেখব না আমি।

—আচ্ছা ঘুমো—ঘুমো এবার।

—রাগ করলি দিদি?

—না রে! রাগ কেন করব?

—মেয়েরা একবার ভালবাসলে আর তাকে ভুলতে পারে না, দিদি। তুই ওকে ভুলতে পারছিস নে?

চিনি কোনও কথা বললো না। চুপ করে শুয়ে রইল। মিনি হঠাৎ বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেখলো, চিনির দু'গাল বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ছে নিঃশব্দে।

ওর অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে চুমু খেতে-খেতে মিনি ডাকলো,

—দিদি!

চিনি ওর বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে চুপ করে শুয়ে রইলো।

ওর থেকে নামতে নামতে মিহির ভাবছিল, চিনিকে সে ধাপ্পা দিতে পারলেও মিনিকে ঠকাতে পারে নি। চিনি সরলা বালিকার মত তার যা কিছু ছিল সমস্তই সমর্পণ করে দিয়েছে মিহিরকে। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চিনির এতই কম যে, তাকে ঠকানো অত্যন্ত সহজ ব্যাপার! বিদ্যে তার যতই থাক এবং বুদ্ধি তার যতই তীক্ষ্ণই হোক, মানব-চরিত্র সম্বন্ধে তার কিছুই ধারনা নেই। চিনিকে এমন করে ঠকানো তার উচিত হচ্ছে না। চিনির জীবনকে এভাবে জ্বালাময়ী করে দেবার সমস্ত দায়িত্ব এবং পাপ—হ্যাঁ পাপই, সবই মিহিরের। মিহির অন্যায় করছে। সজ্ঞানে প্রতারণা করছে চিনিকে।

শিক্ষিত মার্জিত রুচির যুবক মিহির। বর্তমানে শুক্তির উপর মোহ তার যতই প্রবল হোক, চিনির আত্মসমর্পণ এবং অটল বিশ্বাস দেখে সে ভাবলো, দরকার নেই ভক্তিকে। মিহির চিনিকেই বরণ করে নেবে, জীবনে প্রথমে যা সে করতে চেয়েছিল।

কোথায় যেন একটা শঠতা তার মনকে নাড়া দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ করছে, কি হবে তাকে নিয়ে। কোন্ কাজে লাগবে ও! ওর ওপর দরদ আর সহানুভূতিই যথেষ্ট। তার বেশী দিয়ে কেন মিহির তার নিজের জীবনটাকে বঞ্চিত করবে? বিশেষ করে, যখন সে এমন একটা সুযোগ পেয়েছে শুক্তিকে লাভ করবার।

চিন্তিত মিহির ফিরতে লাগলো বাড়ির দিকে। রাত তখন বেশী হয়নি। পথচারীরা ভিড় জমাচ্ছে ট্রামে-বাসে-ফুটপাতে। একখানা রিক্সা নিয়ে মিহির ফিরলো তার ফ্ল্যাটে। দিবাকরবাবুর বাড়িতে তখনও সঙ্গীতচর্চা চলছে—পল্লী সঙ্গীত। হয়তো সেই ভদ্রলোক, যিনি লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন, তিনিই গাইছেন। মিহির অল্পক্ষণ কান পেতে শুনলো। ওই ভদ্রলোকটি বাংলার বহু বিচিত্র পল্লী-গাথা, গান এবং গল্পও সংগ্রহ করে ছাপাচ্ছেন। ঐ থেকে কিছু একটা করা যাবে ভেবে রেখেছে মিহির এবং সেই কথাই আজ সে চিনিকে বলে এলো? অবশ্য কে জানে, সত্যিই কিছু সে লিখতে পারবে কিনা?

বইটা সবে বেরিয়েছে! কাল একখানা এনে পড়ে দেখবে মিহির। না, কাল

হবে না সময় নেই। কাল শুক্তির সঙ্গে যেতে হবে ডায়মন্ডহারবারে বেড়াতে; অথবা দীঘা, বা আর কোথাও নিয়ে যাবে শুক্তি। কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে? 'আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী....' গানের লাইনগুলো মনে পড়লো মিহিরের।

বিছানার চাদরখানা ঝাড়তে ঝাড়তে মিহির ভাবছে, ছোট একটা চাকর রাখবে এবার সে। এই বিছানা ঝাড়া, জুতো বুরুশ করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া কাজগুলো তার আর এখন নিজের হাতে করা উচিত নয়।

এতদিন মিহির সব কাজই শ্রদ্ধার সঙ্গে করে এসেছে। নিজের কাজ নিজের হাতে করাই অভ্যাস তার। এতে তো অগৌরবের কিছু নেই। আগে সে কুকারে রান্না করে খেত। এখন খায় একটা মেসে! সেটা সময়ের অভাবের জন্যে। আজ হঠাৎ চাকর রাখার কথা কেন মনে হলো তার? হলো, কারণ শুক্তি! শুক্তি হয়তো কোনদিন তার ফ্ল্যাটে এসে যেতে পারে। তার চোখে এগুলো খুব খারাপ দেখাবে। কালই একটা চাকর রেখে দেবে মিহির। দিবাকরবাবুকে বললেই হয়তো কালই যোগাড় করে দেবেন তিনি।

শুয়ে পড়ল মিহির। চিনিকে বঞ্চনা করে আসার গ্লানিটা আর মনে পড়ছে না। এখন শুক্তির কথাই মনে জাগছে। কোথায় চিনি, আর কোথায় শুক্তি? ইন্‌ভ্যালিড, অক্ষম একটা মেয়ে, আর সোসাইটির সুন্দরী তরুণী শুক্তি—যাকে লাভ করবার জন্য বহু যুবকের রাত্রি নিদ্রাহীন হয়। চিনির কাছে আজ শেষ বিদায়ই নিল মিহির। ওখানে আর কোনোদিনই যাবে না। যাওয়া আর কোনোমতেই উচিত নয় তার পক্ষে। ঘুমলো মিহির চিন্তা করতে করতে।

উঠেই দাড়ি কামানোর তাগাদা। এখুনি শুক্তির কাছে যাবে। মিহিরকে নিয়ে কোথায় যাবে সে কে জানে? তবে মনে হয়, খুব দূরে কোথাও নয়। দু'—একদিনের মধ্যেই ফিরতে পারবে। পর পর তিনদিন ছুটি আছে—গুডফ্রাইডে, ইষ্টার স্যাটারডে, এবং সান-ডে, অর্থাৎ রবিবার।

তিনদিনের এই ছুটিটা উপভোগ করতেই যাচ্ছে মিহির শুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে। নাকি শুক্তিই যাচ্ছে মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে। পার্টিতে আরও কে-কে যাবেন জানে? নিশ্চয় তার আরো বান্ধবী এবং বন্ধু থাকবেন। থাক না।

দাড়ি কামানো হলো। মুখখানা ধোবার আগেই দিবাকরবাবুর চাকর এসে জানাল,

—বাবু, ফোন।

—যাচ্ছি, যাও।

কিছুক্ষণ পর মিহির এসে ফোন ধরলো। বললো,

—হ্যালো! কে?

—আমি শুক্তি। কত দেরি হবে?

—এই আধঘন্টার মধ্যেই যাচ্ছি।

—তাহলে আরো একঘন্টা পরে আপনাকে আশা করতে পারি! এতটা পথ তো আসতে হবে।

—না, আমি ট্যাক্সি করে যাব। মিনিট পনের লাগবে।

—আচ্ছা, আসুন!

ফোন ছেড়ে দিল শুক্তি। দিবাকরবাবু প্রশ্ন করলেন,

—কোথায় যাবে তোমরা?

—কি জানি? কোথায় যেন বেড়াতে যাবেন ওঁরা সব! আমারও নিমন্ত্রণ আছে।

—ও! তুমি ফিরবে কবে?

—রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ।

মিহির চলে এলো। দেখতে পেল, খঞ্জনা এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করল,

—তুমি এমন চুপচাপ একলা এখানে দাঁড়িয়ে যে?

—কি আর করি! দোক্‌লা যোগাড় হয়নি।

—চেষ্টা কর। জুটে যাবে।

মিহির কথাটা বলতে-বলতে চলে এলো। ওর মনের মধ্যে শুক্তির তাগাদা প্রতিনিয়ত ওকে বিব্রত করছে।

ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিল মিহির। জামা-কাপড় পরতেও বেশ কিছু সময় গেল। তারপর বেরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে গেল খানিকটা সময়। হাত-ঘড়ি দেখলো একঘন্টারও বেশি সময় পার হয়ে গেছে।

ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বখশিসের লোভ দেখিয়ে মিহির প্রায় ছুটেই যখন এসে পৌঁছাল, তখন ডাঃ সত্য রায় পার্টিকে রওনা করে দিয়ে ফিরছে। মিহিরকে দেখে বললো,

—তুই এত দেরি করে এলি?

—কি করব বল? অনেকটা দূরে বাসা। ওরা এখন কোথায় সব?

চলে গেল তো। ট্রেনেই গেল সব। আমিই তাদের তুলে দিয়ে এলাম।

—কোথায় গেলেন ওঁরা?

—নালন্দা দেখতে। এখন আর ট্রেন নেই যে তুই যাবি।

—আমি পরের ট্রেনেই যাব। ঠিকানাটা দে।

—ঠিকানা নেই কিছু। বললো, ওখানে যে-কোন একটা হোটেলে উঠবে সবাই।

—কে কে গেলেন?

—বন্দনা, তার দাদা, অমিতাভ, মিনতি, মঞ্জু, শিবনাথ—তুই সকলকে চিনবিনে। যাক্ গে, তোর আর এদের সঙ্গে যেতে হবে না!

—থাক তাহলে।

কথাটা বললো মিহির, কিন্তু মনের ভিতর এমন একটা ধাক্কা তার লাগলো, যা সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। সত্যর কাছে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরলো না। ওখান থেকে সোজা হাওড়া স্টেশনে এলো, টিকিট কাটলো এবং সটান রওনা হলো নালন্দা দেখতে—একা।

অমন করে সেজেগুজে বেরিয়ে মিহির যদি বাসায় ফেরে তো খঞ্জনা কথা শোনাবেই, মিনিও ঠাট্টা করতে কিছু বাকি রাখবে না। অতএব যে কোনো প্রকারে দিন-তিনেক বাইরে থাকাই ভালো।

মিহির পৌঁছবে কখন কে জানে? পাশের বেঞ্চে বসা এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে টাইম টেবিল চেয়ে নিয়ে দেখলো—আজ আর তাকে পৌঁছতে হবে না, কাল পৌঁছবে। কয়েক ঘন্টার অবসর রিক্ত মন নিয়ে।

মনটা তিক্ত হয়ে যাচ্ছে মিহিরের। এত দেরি হলো শুরু ট্যাক্সির জন্য। এর থেকে বাসে এলে আগে আসা যেত। কিন্তু শুক্তি যদি ফোনে জানিয়ে দিত তাকে যে, তারা পাটনা যাবে, তাহলে তো সে সটান হাওড়া স্টেশনে গিয়েই ওদের ধরতে পারতো। শুক্তি তা জানালো না কেন? মধ্য কলকাতা থেকে পুরো দক্ষিণে গিয়ে, আবার উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়ার সময় তো বড় কম লাগে না। শুক্তির এটা ইচ্ছাকৃত গোপনতা, নাকি সে এতটা খেয়াল করে নি?

গেছে ওরা কয়েকজন ব্যক্তি একসঙ্গে। বন্দনার দাদা বড় ইঞ্জিনিয়ার, অমিতাভ আমেরিকা-ফেরৎ বড় ডাক্তার, শিবনাথ কৃষিবিজ্ঞানী। আর কে-কে আছেন কে জানে? ভালো! দেখা যাক, কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় মিহির।

ট্রেন ছেড়ে দিল। রাত হলো অনেক; ঘুম হলো না মিহিরের। দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না সে নানান চিন্তার জন্য। সকালে সে নামলো পাটনায়। এখানে তার এক বন্ধু থাকে, নাম সন্তোষ। এরোড্রামে কাজ করে। বাসার ঠিকানা জানা ছিল। সে গেল সন্তোষের বাড়ি।

অনেকদিন পর দেখা দুজনে। বন্ধুকে স্বাগত জানাল সন্তোষ। বড় বাংলোর মতো বাসা সন্তোষের। আরামেই সে রইলো ওখানে। বৈকালে বেরুলো বেড়াতে।

নালান্দায় মিহির আর যাবে না। মনে মনে স্থিতাবস্তা এসে গেছে। তাই শনিবার সন্তোষ দেবের বাসায় থেকে রবিবার রাত্রে ফিরবে ঠিক করলো।

পরদিন সকালে মিনি একজন ভদ্রলোককে ডেকে আনলো। বছর পঞ্চাশ বয়স। সুশ্রী চেহারার মানুষটি এসে বিনীত অভিবাদন জানালেন চিনিকে। পরিচয় দিলেন তাঁর নাম প্রভাব পাঞ্জা।

পাঞ্জা মশাই মশাই জানালেন, তিনি সরকারে শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে কাজ করেন। দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে তাঁকে যেতে হয়। এই সুযোগটার সদ্ব্যহার করেছেন তিনি নানা স্থানের লোকগাতা সংগ্রহ করে। নিজের পয়সা খরচ করে এটা করা তাঁর পক্ষে অসাধ্য ছিল। দিবাকরবাবু তাঁর দেশের লোক-পরিচিত বন্ধু। তাঁরই উপর বইখানি ছাপার ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। দিবাকরবাবু তাঁর একজন পরিচিত পন্ডিত প্রফেসরকে দিয়ে প্রুফ দেখিয়ে বইখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর করে ছেপে দিয়েছেন। খবর পেয়ে প্রভাতবাবু মাত্র কাল কলকাতায় এসেছেন।

মিনির সঙ্গে দিবাকরবাবুর মেয়ের বন্ধুত্ব আছে। ওখানেই মিনির আলাপ হয়েছিল কাল প্রভাতবাবুর সঙ্গে। আজ ফোন করে এখানে আসতে আমন্ত্রণ করলো।

—খুব আনন্দ পেলাম আপনার আসায়। আপনার বইটা দেখতে চাই।

—এই নিন। অনুগ্রহ করে উপহার-স্বরূপ আপনি বইটি গ্রহণ করুন।

—ধন্যবাদ।

চিনি সাগ্রহে গ্রহণ করলো বইখানি।

সুন্দর ছাপানো, শোভন অলঙ্করণ আর মজবুত বাঁধাই-করা বই 'বাংলার লোকসাহিত্য'। একজন বিখ্যাত ব্যক্তির লেখা একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। চিনি তার এক হাত দিয়ে বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো,

—ছাপা তো ভালোই হয়েছে। ভুল-টুল নেই তো?

—কি জানি? আমি এখনও দেখিনি। যিনি প্রুফ দেখেছেন, তিনি একজন প্রফেসর। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেলাম—শুনলাম বাড়ি নেই তিনি। কোথায় বেড়াতে গিয়েছেন।

তিনি ফিরলে দেখা হবে নিশ্চয়।

—না! এবার হলো না। আমার তো আর ছুটি নেই। আজ রাত্রেই ফিরতে হবে।

প্রভাতবাবুকে চা খাওয়ালো মিনি। অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ভদ্রলোক। কথায় কথায় বললেন,

—সুদূর পল্লী অঞ্চলে কত যে কথা আর কথকতা আছে, কত যে প্রবচন আর পরীক্ষিত মিষ্টিযোগের ওষুধ, তন্ত্র-মন্ত্রের কত হদিস আছে তা বলার নয়।

—সব সংগ্রহ করেছেন?

—সব না, কিছুকিছু করেছি।

—আপনার এই বইখানা থেকে যদি কেউ থিসিস লেখে?

—লিখুন না! সানন্দে বললেন প্রভাতবাবু—খুবই তো আনন্দের কথা। লিখবেন আপনি। লিখবেন?

—চেষ্টা করব। অবশ্য আরো যোগ্যতম লোক যদি কেউ লেখেন তো ভালো হয়।

—আপনিই যোগ্যতমা। এই ক'মিনিটের কথায় বুঝেছি, আপনি লিখলে আমি সব থেকে বেশি খুশী হবো।

—যিনি প্রুফ দেখেছেন তিনি যদি লেখেন?

—তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কোনো কথাও হয়নি এখনও। তাছাড়া

এই বই নিয়ে এবং আরো নানা বই নিয়ে থিসিস তো যে কোনো লোক লিখতে পারে। তাছাড়া বই তো আমি বাজারে বেচবো।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—আচ্ছা, আজ আসি তাহলে। আবার কলকাতায় এসে দেখা করবো।

—নিশ্চয় করবেন। আবার আপনি এলে আপনার কাছে পল্লীর গল্প শুনব।

—আচ্ছা, আচ্ছা, শোনাব খুব মজার মজার গল্প। অনেক কিংবদন্তীর গল্প শোনবার আছে।

হেসে বিদায় নিল ভদ্রলোক। মিনি এতক্ষণে বললো,

—এবার বুঝলি তো, মিহির তোকে কেমন ধাপ্পা দিয়েছে।

—যাক গে! তুই যা এখন। বইখানা পড়ি।

—পড়।

মিনি চলে গেল।

চিনি নিবিষ্ট মনে বইখানা খুলে দেখছে। ও কি প্রথম ভূমিকাটা পড়বে নাকি? না। আগে বইখানা পড়ে পরে ভূমিকা পড়লে ভূমিকার বক্তব্য ভালোভাবে বোঝা যাবে। চিনি পড়তে আরম্ভ করলো।

কত বিস্ময়কর কথা, কত আশ্চর্য কাব্যরস, কত মাধুর্যমাখা প্রেম-বিরহ-মিলনের ইতিহাস? কিন্তু সকলকে ছাড়িয়ে রয়েছে একটি পবিত্র-সুন্দর-আত্মা—যাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায়-অনুভব করা যায়! সেটা হলো বাংলার বিশেষ-বিশেষ সাধন-ধারার সঞ্চিত আধ্যাত্মিকতা।

প্রতিটি গাথার মধ্যে কী এক অপূর্ব ঈশ্বরপ্রেম সদা জাগ্রত। ঈশ্বরবানুভূতিকে মজ্জাগত করতে না পারলে এমনভাবে এত সাবলীল ভঙ্গিতে তার প্রকাশ-ব্যঞ্জনা সম্ভব নয়। চিনি আরও দেখল, এই ছড়াগুলিতে 'মা' শব্দটা যেন সকলকে জুড়ে সকলকে ছাপিয়ে, সকলের হৃদয় নীপ্যমান।

পথের পথিক, দুয়ারের ভিখারী, নিরন্ন বা ধনী-রাজ-জমিদার সকলেই এই 'মা' শব্দটার কাঙালী। মা-মা-মা! এই মাতৃ-ভাব যেন আকাশে-বাতাস ছাড়িয়ে, এই নীল নভোতলে গিয়ে লয় হয়েও হচ্ছে না—ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে ভেসে আসছে কানে 'মা-মা-মা'।

চিনি এই মাতৃ-ভাব নিয়ে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখবে ঠিক করলো।

বইটা সারাদিন সে পড়েছে। রাত্রি হলো। তখনও কয়েক পৃষ্ঠা বাকি রয়েছে 'লোকসাহিত্য' শেষ হতে। মিনি এসে ধমক দিয়ে বললো,

—আর পড়ে না। এবার ঘুমো।

—এই অধ্যায়টা শেষ করে নিই।

—না। আর একটা লাইনও না।

বইটা কেড়ে নিল মিনি। শুইয়ে দিল চিনিকে জোর করে। তারপর আলো নিভিয়ে দিয়ে দিদির গলা জড়িয়ে ডাকলো,

—দিদি!

—বল।

—মিহিরবাবু বেড়াতে যাচ্ছিলেন শুক্তিদের সঙ্গে। তাঁরা কেমন বুদ্ধি করে ওকে বোকা বানিয়ে গেছেন শুনবি। ভারি মজা করেছেন।

—কী ব্যাপার রে?

—ওঁরা ফোন করলেন হাওড়া স্টেশনের পাবলিক ফোন থেকে। কিন্তু বললেন না ফোনটা কোথা থেকে করা হলো। মিহিরবাবু জামা-জুতো পরে ট্যাক্সি নিয়ে সটান গেলেন শুক্তিদের বাড়ি। গিয়ে শুনলেন, ওরা বহুক্ষণ রওনা হয়ে গেছেন—ট্রেনেও চড়েছেন। গেছেন নালন্দা দেখতে। তাই ট্রেনে উনি সটান নালন্দার দিকে যাত্রা করেছে। মোহটা কত বেশি বোঝ এইবার!

—হ্যাঁ, কিন্তু ওঁরা বললেন না কেন মিহিরবাবুকে হাওড়া স্টেশনে যেতে?

—শুক্তির কাজই তো এই! সে অমিতাভ নামক জনৈক আমেরিকা-ফেরত ডাক্তারকে পেয়েছে। ঘটক হচ্ছেন ওর দাদা, শ্রীসত্য ডাক্তার নিজে। অতএব সহজেই বুঝতে পারছিস দিদি যে, মিহির এখন বাতিল।

—বাতিল কেন?

—তোর মতো মুখ্যু মেয়েকে বোঝানো যাবে না বুঝলি!

—কেন?

—কারণ, মিহির তো কোনো একটা কলেজের সামান্য মাইনের প্রফেসর—না আছে বাড়ি, না আছে গাড়ি। তাকে শুক্তি বিয়ে করবে কেন? আর ঐ অমিতাভ—বিলেত-ফেরত লাখপতির ছেলে। বিলেত মার্কা পোশাক-পরিচ্ছদ, বর্ণে-অসবর্ণে একেবারে সাহেব লোক। তাকে পেলে মিহির তো তার কাছে একেবারে চাকর বনে যাবে।

চিনি চুপ করে ভাবছে। তাকে নীরব থাকতে দেখে মিনি বললো,

—ঘা খেয়ে মিহির হয়তো ফিরতে পারে। কিন্তু খুব সাবধান দিদি!

—কি সাবধান হব?

—ওকে নিবিনে কিছুতেই! ও বঞ্চক, ও ঠক, প্রতারক—বিশ্বাসঘাতক—

—চুপ কর মিনু।

—অসহ্য লাগছে? হায় রে, দুর্ভাগিনী নারীর প্রেম। তোর জন্য কান্না পাচ্ছে দিদি। এই স্বর্গীয় প্রেম তুই ঐ লোফার লোকটাকে কেন দিলি?...কেন দিলি? মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার।

মিনি সত্যই চিনির বুকের ওপর মাথাটা ঠুকতে লাগলো। চিনি ওকে শান্ত করে ধীরে ধীরে বললো,

—লক্ষ্মী বোনটি, আমার প্রেম নিষ্কলঙ্কই থাক। এটাই তুই ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। আমি যেন কোনো অবস্থাতেই দ্বিচারিণী না হই।

মিনি অবাক চোখে চেয়ে আছে চিনির মুখের দিকে। চিনি আবার বললো,

—যেটুকু আমি পেয়েছি তা অতি সামান্য। তবু একদিন একমুহূর্তের জন্য উনি আমায় ভালোবেসেছেন। এই সত্য আমার জীবনে আমি অমর করে রাখব মিনু।

—হা ভগবান! এই আশ্চর্য প্রেমকে তুমি বঞ্চনা করলে প্রভু। এত নিষ্ঠুর তুমি?

—মিনি পাশ ফিরে শুলো কাঁদছে সে।

নালন্দার নাম কোন্ শিশুকাল থেকে শোনা। দেখবার ইচ্ছেটা খুবই প্রবল মিহিরের মনে। কিন্তু থাক, নালন্দায় সে আর যাবে না। শুক্তি যে ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়েছে, এটাই যেন এবার তার বিশ্বাস হলো। দেখা যাক, কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় মিহির।

বৈকালে বার হলো মিহির। শহরটা দেখে বেড়াচ্ছে সে। সন্তোষের ছেলেমেয়ের জন্য কিছু খেলনা কিনলো। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরল। সন্তোষ বললো,

—এবার বিয়ে কর মিহির। আর দেরি করলে ছেলেমেয়ে মানুষ করবি কখন?

—হ্যাঁ। এখনই বিয়ে করা দরকার। সম্প্রতি আমি সেই চেষ্টায় ঘুরছি।

—ঘুরতে হবে না। আমার এক শালী আছে তোর যোগ্য মেয়ে। করবি? না। অসম্মান বোধ করিস নে। কারণটা শোন।

কথাটা বলে সে বিমলবাবুর বাড়িতে টিউশনি করার ইতিহাসটা বললো সন্তোষকে। বললো খুব ধর ভাবেই—ওকে চোখে কখনও দেখিনি। শুধু গান শুনেছিলাম, আর দেখেছিলাম ওর অপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর ওর ভাই-বোনের খাতায়। ভাই আর বোন 'দিদি' বলতে অজ্ঞান। কে জানে, কেমন করে ঐ না-দেখা মেয়েটির দিকে মনটা ছুটতে চাইতো। অবশেষে একদিন দেখলাম। পঙ্গু, অকর্মণ্য একটা মেয়ে—কীটদষ্ট ফুলও ভালো তার থেকে।

—তারপর?

—ওকে কে জানে, কেন ভালোবেসে ফেললাম। ঠিক করলাম বিয়ে করব।

—ঐ ইন্‌ভ্যালিড মেয়েকে?

—হ্যাঁ। তারপর শোন। ওর পালক-পিতামাতার সম্মতিও পেলাম। আর পেলাম ওরও সম্মতি।

—ভাল। তারপর?

—হঠাৎ ব্যঘাত ঘটলো।

—আবার ব্যাঘাত কিসের?

—ব্যাঘাত আমার ডাক্তার-বন্ধু সত্য রায়। চিনিস তো তাকে?

—হ্যাঁ। সে তো বিলেত ঘুরে এলো।

—হ্যাঁ। তাকে ডেকে দেখালাম চিনিকে। সত্য ডাক্তার বললো—ও কোনোদিন ভালো হবে না। অনর্থক বোকামী করিস্‌নে। আমার বোন শুক্তিকে বিয়ে কর। প্রস্তাবটা খুব অতর্কিত এবং অতিশয় লোভনীয়।

—অবশ্যই। তাই করবি নাকি?

—ভাবছি।

—ভাব। ভেবে ঠিক কর। কিন্তু তুই একটা অন্যায় করেছিস মিহির। মারাত্মক অন্যায় করেছিস।

—কি অন্যায় করেছি?

—তুই এই মেয়েটিকে—চিনি না কি নাম বললি—বিভ্রান্ত করেছিস।

কেন তুই তার মনে একটা আশা জাগালি? তোর ও পাপ ক্ষমার অযোগ্য।

তীক্ষ্ণ, তীব্র ভর্ৎসনা করলো সন্তোষ মিহিরকে। নিঃশব্দে শুনলো মিহির। তারপর ধীরে ধীরে বললো,

—আমার অন্যায় আমি জানি সন্তোষ। এটা শুধু পাপ নয়, মহাপাপ তাও জানি। তবে মনে হয়, সে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। পড়াশোনাতেই তার ঝোঁক বেশি। তার জীবনের এই সামান্য ঘটনা সে নিশ্চয়ই ভুলে যাবে।

—না, যাবে না। যদি সে স্বাভাবিক সাধারণ মেয়ে হতো তো এই ব্যাপারটাকে আমলই দিত না, কিন্তু সে তা নয়। একটা ইন্‌ভ্যালিড মেয়ে সে বুদ্ধিতে প্রদীপ্ত, প্রতিভার অপরাজেয়, সঙ্গীতে মাধুর্যময়ী, অথচ যার জীবনে সফলতার কোনো আশাই ছিল না তার মনে তুই একটা সুখের নীড় রচনার স্বপ্ন জাগিয়ে দিয়েছিস। এ সে কোনোদিন ভুলবে না।

—কেন?

—কারণ, আর কেউ তার মনে এ আশা জাগাতে যাবে না। তোর মতো আহাম্মক আর কেউ নেই। ওকে প্রেম জানাবার পূর্বে তোর ভালো করে নিজেকে তৈরি করা উচিত ছিল।

—এখন আমি কি করতে পারি সন্তোষ।

—আমার কোনো সাজেশন নেই। ওকে বিয়ে করতে বলে তোর জীবনটাও পঙ্গু করতে বলব না আমি। অভাগী মেয়েটাকেই এখন সয়ে যেতে হবে ধীরে ধীরে! সইবার জন্যই হয়তো সে পৃথিবীতে জন্মেছে!

নিঃশব্দে ওর কথাগুলো শুনছে মিহির। সন্তোষ আপন মনে বলতে লাগলো,—মা নেই, বাপ নেই। ভাই-বন্ধু কেউ নেই। পরের বাড়িতে পঙ্গু, হয়ে সে পড়ে আছে। তোকে অবলম্বন করে সে লতার মতো জড়াতে চেয়েছিল। ছিঃ মিহির! এ তুই কি করেছিস? তুই এতখানি নিষ্ঠুর!

নিঃশব্দে দুজনের কয়েক মুহূর্ত কাটলো। সন্তোষের স্ত্রী এসে বললো,

—খাবে এস। আসুন মিহিরদা।

—চল।

দুজনে গিয়ে খেতে বসলো। সন্তোষ যথেষ্ট বলেছে। আর এ বিষয়ে কোনো কথা সে বলতে চায় না। মিহিরই বললো,

—আমি ওর কাছে অপরাধীই থেকে গেলাম সন্তোষ।

—হ্যাঁ। ঈশ্বর তোকে মার্জনা করুন।

—শুক্তি সম্বন্ধে কি করা যায় এখন?

—পারিস তো বিয়ে কর তাকে। তবে তোর কথা শুনে আমি যতদূর ভেবেছি শুক্তি তোকে বিয়ে করবে না।

—বিয়ে করবে না! কেন?

—না! কারণ, ওরা অত সহজে জড়ায় না নিজেকে। ওরা অনেক ভাববে, অনেক দেখবে, তবে আসবে। শুক্তি তো আর ইন্‌ভ্যালিড চিনি নয় যে, জলে ডুবিয়ে দিলেই গুলে সরবৎ হয়ে যাবে। যা, শো গিয়ে।

বলে, সন্তোষ চলে গেল তার নিজের কামরায়। ওর বৌ মলিনা বললো,

—আপনারা কি সব বলাবলি করছেন দাদা?

—ও কিছু নয়। তোমার ওসব না শোনাই ভালো!

—আমি কিন্তু জেনে ফেলেছি। প্রফেসর দেবব্রত রায়ের মেয়ে তো? বি. এ. পাশ করে বিয়ের চেষ্টায় ঘুরছে। ওকে বিয়ে করলে আপনি বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়ে যাবেন। কিন্তু সামলাতে পারবেন তো?

—বেসামাল হবার আশঙ্কা আছে নাকি?

—যথেষ্ট আছে! অমন বহির্মুখী মেয়ে আর দেখিনি। ওর পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা সহস্রাধিক মেয়ে বন্ধুর সংখ্যা বিশ-পঁচিশটা মাত্র। ওর চোখের সুগন্ধি সুর্মা আর কাজলের দাম যোগাতে আপনার প্রফেসারির মাইনেয় কুলোবে না।

—বল কি? এমন! আমি তো দেখিনি কোনোদিন এ রকম কোনো কিছু।

—বিয়ে করার পর দেখতে পাবেন। এখন দেখাবার মতো বোকা মেয়ে শুক্তি নয়। যান, শুয়ে পড়ুন গে।

চলে গেল সন্তোষের স্ত্রী।

রাত হয়েছে। মিহির তার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে এসে শুলো। একটা চাকর রেখে দিয়েছে সন্তোষ মিহিরের জন্যে। সে এসে বললো,

—হুজুর! কাল চার বাজে যাইবেন তো?

—নেহি। কাল রাত সাড়ে আট বাজে মেল ট্রেনে মে যাব।

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

চাকরটা চলে গেল।

মিহির শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলো চিনির কথা নয়, শুক্তির কথা। সন্তোষের বৌ-এর বলা কথাগুলো আবর্তিত হচ্ছে তার মস্তিষ্কে।

কলকাতায় ঐ পাড়ার মেয়ে সন্তোষের বৌ। শুক্তিকে সে নিশ্চয় চেনে—খুব ভালো ভাবেই চেনে। এখন কি করবে। আলেয়া-শুক্তির পিছনে ঘোরা তার ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু শুক্তিকে অকারণ দোষ দেওয়া যায় না। বড়লোকের মেয়ে। হয়তো সে একটু বেশি খরচ করে। তাকে কী! শুক্তির সেটা গুণই। কৃপণ সে নয়। কেনই বা হবে? তার তো কোনো অভাব নেই। তবে তার বন্ধুর সংখ্যা সহস্র—এটা যেন বাড়াবাড়ি কথা বললো সন্তোষের স্ত্রী। এতটা সত্যি নয়।

এ যুগে মেয়েদের পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা কিছু বেশি থাকে। তা থাক। তাতে ক্ষতি কিছু নেই। তবে, একটা কথার সমাধান হচ্ছে না। এই নালন্দা যাবার কথাটা মিহিরই বলেছিল একদিন শুক্তিকে। তখন অবশ্য শুক্তি সায় দেয়নি। অথচ সে এলো নালন্দা দেখতে, আর প্রস্তাবক মিহিরকেই বাদ দিল কেন সে? এই প্রশ্নই তার মনে বার বার উঁকি দিতে লাগলো।

পরদিন ট্রেনে উঠে সোমবার সকালে হাওড়ায় পৌঁছাল মিহির। ট্রেন থেকে নেমেই দেখতে পেল, পাশের প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে অমিতাভ হাত ধরে নামাচ্ছে শুক্তিকে।

শুক্তির দল পিছনের দিকে রয়েছে। মিহির আর ওদের দিকে তাকাল না। সুটকেশটা হাতে নিয়ে সটান চলে এলো হনহন করে। এবার বাস ধরে বাড়ি।

যথাকালে কলেজে গেল মিহির পড়াতে। ফেরার পথে একটা বই-এর দোকানে তার লেখা বই-এর খবর নিল। বিক্রি ভালোই হচ্ছে বাংলার রূপকথা। সে কিছু টাকা পাবে। তবে প্রকাশক জানালেন, আরও উন্নত ধরনের বই লিখতে হবে।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ক্লান্ত মিহির সেই 'লোকসাহিত্য' বইখানা পেল খঞ্জনার কাছ থেকে। সেই সঙ্গে খবর পেল, লেখক প্রভাতবাবু নাকি চিনির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। দেখা করে বাড়ি গেছেন। মিহির বললো,

—আমার সঙ্গে তার তো দেখা হলো না।

—না, কি করে হবে বলুন! আপনি তো নালন্দা বেড়াতে গিয়েছিলেন।

—হুঁ! বলে, মিহির চুপ করলো।

খঞ্জনা চলে এলো ওখান থেকে। মিহির ভাবতে লাগলো, প্রভাতবাবু কেমন লোক কে জানে? চিনির সঙ্গে কেন তিনি দেখা করেছেন! অবশ্য দেখা করাটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু আবশ্যকটা কোথায়? কি ভাবে তিনি পৌঁছলেন চিনির কাছে? নানা প্রশ্ন আন্দোলিত হতে লাগলো তার মনের মধ্যে। কিন্তু খুবই ক্লান্ত ছিল মিহির। ঘুমিয়ে পড়ল অল্পক্ষণের মধ্যে।

পরদিন খঞ্জনাকে প্রশ্ন করে জানলো, মিনিই ডেকে নিয়ে গেছে প্রভাতবাবুকে। মিনি যে কি রকম গুপ্তচর মেয়ে তা এরই মধ্যে টের পেয়েছে মিহির। তবু সেটা যাচাই করা দরকার। মিহির একটা ফোন করলো বিমলবাবুর বাড়িতে। অপর দিকে মিনি ধরতেই বললো,

—আমি মিহির। তোমরা সব ভালো আছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভালো নিশ্চয় আছি। মন্দ কেন থাকব? আপনি নালন্দা নাকি কালিন্দী কি যেন দেখে এলেন। কেমন লাগলো?

—ভালো। সে একটা দেখবার মতো জিনিস। সে যাক, তোমার দিদি কি 'লোকসাহিত্য' বইটা পড়েছে?

—হ্যাঁ। পড়ে-পড়ে প্রায় মুখস্ত করে ফেলেছে। শুনুন—

'আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
উড়কী ধানের মুড়কি দেব পথে জল খেতে।'

শুনেছেন? কী মিষ্টি সব ছড়া! আর জানেন স্যার, উনিও খুব মিষ্টি।

—কে?

—ঐ প্রভাতবাবু। প্রভাতের পদ্মের মতো সুন্দর আর মধুময়। আর কী সুগন্ধি—আর, আর কি পবিত্র!

—ও! শুনে খুব খুশী হলাম। ওঁকে বিয়ে করবে নাকি?

—না! উনি সূর্যের মতো অনেক উঁচুতে। নাগাল পাবনা। আচ্ছা নমস্কার।

ফোন ছেড়ে দিল মিনি।

সিচুয়েশনটা সামলাতে পারছে না মিহির। যেন ভাগ্য তাকে কোথায় বিড়ম্বিত করছে। একটা অদৃশ্য বিরুদ্ধ শক্তি সর্বত্রই ক্রিয়াশীল। ক্রমশ চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলো মিহিরের মন।

চিনির কাছে যাওয়া এখন সম্ভব হচ্ছে না। কারণ মিহির যে শুক্তির দিকে ঝুঁকেছে, এ খবর আর কেউ না জানুক মিনি জেনে ফেলেছে এবং মিহিরের নাম তাদের আত্মীয়বর্গের তালিকা থেকে কেটে দিয়েছে। এ ভালোই হয়েছে। চিনি এখন সেই 'লোকসাহিত্যে'র লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। হয়তো তাঁর সান্নিধ্য, তার সৎ-প্রেরণায় চিনি অবিলম্বে সুস্থ হয়ে উঠবে এবং মিহিরে কথা ভুলে যাবে।

যাক্, ভুলেই যাক চিনি মিহিরকে। কারণ, মিহির তো তাকে গ্রহণ করতে পারলো না। অনর্থক আশা দিয়ে ঐ অভাগী মেয়েটিকে বঞ্চনা করে মিহিরের মন আজ সত্যিই পীড়িত। এ ভালোই হলো। ভাগ্যই তাকে বাঁচালো।

ভাবছে মিহির চিনির বলা কথাগুলো। চিনি একান্তভাবেই আত্মসমর্পণ করেছিল মিহিরকে। সেই চিনি কি প্রভাতবাবুর মতো একজন স্বল্প-পরিচিত ব্যক্তিকে ভালোবাসবে? কে জানে, হয়তো হতেও পারে। এ ভালোই হলো। বাসুক ভালো তাকেই। পার তো বিয়ে করে সুখী হোক।

কিন্তু মিহিরের মন কোথায় যেন একটু অসুস্থ বোধ করছে! চিনিকে সে সত্যিই ভালোবেসেছিল। অথর্ব-অক্ষম-অযোগ্য জেনেও তাকে জীবনের সাথী করতে চেয়েছিল। এই সত্যটা মিহির হয়তো অগ্রাহ্য করেছে শুক্তির জন্য, কিন্তু চিনি অগ্রাহ্য করলো কি করে? হয়তো রাগে, হয়তো বা অন্য কোনও কারণে। যে জন্যেই হোক, চিনি তাকে ভুলে গেছে অথবা যতশীঘ্র সম্ভব ভুলবে।

সেদিন শুক্তির হাত ধরে নামতে দেখেছে অমিতাভকে। কিন্তু তাতে কি? ওরকম কারো হাত ধরে কোনো মেয়েকে নামানো তো বর্তমান যুগের এটিকেট। এতে খারাপ ভাববার বা চিন্তা করার কি আছে?

শুক্তির খবর ক'দিন নেওয়া হয়নি। একবার খবর নেওয়া দরকার। একটা ফোন করে আগেই জেনে নিতে হবে, ওখানে কি রকম পজিশনে আছে মিহির!

সত্য ডাক্তার নিজের মুখেই বলেছিল, শুক্তিকে দেবে তারা মিহিরের হাতে। সে-কথা তো ওরা প্রত্যাহার করেনি। অমিতাভ ঐ সমাজের ছেলে। শুক্তির সঙ্গে ওর দীর্ঘকালের পরিচয়। ওরা তো অনেক আগেই বিবাহিত হতে পারতো! না, অমিতাভর সঙ্গে সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই শুক্তির।

মিহির আকরণ ভুল করছে শুক্তির সম্বন্ধে। অবশ্য সন্তোষের স্ত্রী মলিনার কথাগুলো মনে পড়লো তার।

মিহির ভাবলো, ধনীর দুলালী শুক্তি যদি হয়ই একটু খরচে মেয়ে, তো কি এমন এসে যাবে? মিহির এখন যথেষ্ট রোজগার করে। আরও বাড়তি আয় করবে সে উঁচু ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক লিখে; তার বই বাজারে বিক্রি হবে। লিখবে কিছু নোট বইও। প্রকাশক অনুরোধ করেছেন।

মিহিরের মনে নানা চিন্তার জাল বোনা হচ্ছে। কোনোটাই ঠিকমতো রূপ নিচ্ছে না। যেন ভাঙা-ভাঙা ঢেউ। মনটাকে একটু সুস্থ করা দরকার। আলনা থেকে বুশশার্টখানা টেনে নিয়ে গায়ে দিল সে। হাতঘড়ি পরতে পরতে বেরুলো একটু বাইরে। সিঁড়ির কাছে বারান্দায় খঞ্জনা জিজ্ঞাসা করলো,

—কোথায় যাচ্ছেন মিহিরদা?

—এই একটা পার্কে বেড়াব।

—আমি যাব সঙ্গে?

—এসো।

বৈকালিক প্রসাধন খঞ্জনার করাই ছিল। বেরুবার মুখে মাকে বললো,

—আমি মিহিরদার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি মা।

—আচ্ছা, যা!

খঞ্জনা আর মিহির নেমে এলো নীচে। কাছেই একটা পার্ক। কিন্তু খঞ্জনা বললো,

—উহুঁ! ওদিকে নয়।

—তবে কোন্ দিকে?

—বিপরীত দিকে, চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে। সরকারি শিল্প প্রদর্শনী দেখতে যাব।

—ও! তাই চল। কিন্তু সে তো অনেকটা দূর।

—আপনি একটা রিক্সা ডাকুন।

রিক্সা ডাকা হলো। উঠলো দুজনে। মিহির শুধালো।

—ওখানে কি কাজ আছে তোমার?

—না, শুধু দেখব। ভালো ভালো তাঁতের শাড়ি নাকি এসেছে।

—শাড়ি! বাঃ, কতগুলো শাড়ি হলো তোমার? নিশ্চয় ডজন দশ?

—না-না, দশ ডজন কোথায় পাব মিহিরদা? তবে বোধ হয় ডজন দুই হবে।

—ওখানে কিছু শাড়ী কিনবে নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, যদি পছন্দ মতো পাই।

—শাড়ি কিনতে মেয়েদের এত উৎসাহ কেন খঞ্জনা?

—কেন আবার? গয়না তো অল্প পয়সায় হয় না। আজকাল যা সুন্দর সব শাড়ির ডিজাইন বেরুচ্ছে! গয়নার দরকার হয় না।

—সে কথা সত্যি! তাছাড়া সোনার বাজারের যা অবস্থা চট্ করে কেনা অসম্ভব।

এসে পড়লো দুজনে। ঢুকলো ভিতরে। দেখে বেড়াচ্ছে! একখানা ভালো শাড়ি পছন্দ করলো খঞ্জনা। দাম বলল পঁচাত্তর টাকা।

অত টাকা নেই খঞ্জনার কাছে। মাত্র পঞ্চাশ টাকা আছে। মিহির দিল বাকি পঁচিশ টাকা!

—নমস্কার! কে এই মেয়েটি?

মিহির তাকিয়ে দেখল শুক্তি। সঙ্গে অমিতাভ, শিবনাথ; নন্দিতা এবং বন্দনা।

শুক্তি এগিয়ে এসে দেখলো শাড়িখানা। মিহির বললো,

—নমস্কার। ও আমার বাড়িওয়ালা দিবাকরবাবুর মেয়ে! শাড়ির শখ ওর আর মিটছে ন! যাক্, আপনারা সব ভালো আছেন তো?

—হ্যাঁ, ধন্যবাদ। সেদিন আমরা আপনার জন্য লাষ্ট মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম।

—অনেক ধন্যবাদ। তবে আমার কিছু বলার আছে।

বলুন।

—আমাকে জানানো হয়নি যে, ফোনটা স্টেশন থেকে করা হচ্ছে। আমি প্রায় ছুটেই টালিগঞ্জ গেলাম। গিয়ে শুনলাম, আপনারা সদলবলে হাওড়া স্টেশনে রওনা হয়ে গেছেন বেশ কিছুক্ষণ আগে।

—আপনি এতবড় ভুল করবেন জানতাম না।

কথাটা নরম সুরে বলল শুক্তি। জবাবে মিহির উষ্ণ স্বরেই বললো,

—ভুল আমি নিশ্চয় করিনি। যখন আপনি ফোন করেন, তখন ট্রেনের

বাহাত্তর মিনিট বাকি ছিল। অতক্ষণ আগে আপনারা হাওড়া স্টেশনে যাবেন তা কেমন করে জানবো? টিকিট নিশ্চয় আগেই কিনেছিলেন। আর তা আগে না কিনলেও অসুবিধা হতো না।

—কয়েকটা মাল বুক করতে হয়েছিল।

—সেগুলো আপনার বাড়ির সরকারই করেছেন নিশ্চয়। আশা করি নিজে নিশ্চয়ই বুকিং অফিসে গিয়ে মাল বুক করেননি?

—আমরা একটু আগেই গিয়েছিলাম। শুক্তির সুর নেমে গেল। বললো, যাক! যা হবার হয়েছে। চলুন আষাঢ় মাসে পুরী যাই।

আষাঢ় আসতে অনেক দেরি আছে। ততদিন কে মরে, কে বাঁচে কে জানে? বেঁচে থাকি তো যাব।

শুক্তি বললো—তোমার নামটি কি ভাই?

শ্রীমতী খঞ্জনা ভঞ্জ।

স্কুলে পড় তো?

—না। এগারো ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিলে কেন?

—মা বললো আর পড়তে হবে না। যক্ষিণী হয়েছিস, আরও পড়লে রাক্ষসী হয়ে যাবি। রান্না শেখ, লেপ-কাঁতা সেলাই করতে শেখ, আর ঘর-দোর ঝাঁট দিতে শেখ, শিবপূজা করতে শিখে নে ভালো করে।

—শিবপূজা কর তুমি?

—হ্যাঁ। ধ্যায়েনিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং......

—থামো, থামো! আর বলতে হবে না। কোথায় শিবপূজা করো তুমি।

—কেন ঠাকুরঘরে। বাড়িতে আমাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীকরঞ্জাক্ষ শিব আছেন।

—আচ্ছা-খঞ্জনা, তোমাদের বাড়ি গিয়ে একদিন তোমার শিবপুজো করা দেখে আসব।

—সত্যি যাবেন? যান তো খুবই খুশী হবো। বিশ্বাস হচ্ছে না কিন্তু।

—বিশ্বাস হচ্ছে না কেন?

—আপনারা তো ওসব মানেন না।

—কে বললে?

—আমার বন্ধু, মিহিরদার ছাত্রী মিনি বলে, ওপাড়ায় কোনো উৎসব নেই। পুজো ওরা করে না। ওরা বিয়ে করে, আর বিলেত যায়—বিলেত যায় আর বিয়ে কর।

সবাই হেসে উঠলো ওর কথা শুনে। মিহির চুপ করেছিল। সেও হাসছিল।

বললো,

—তোমার বন্ধুর কথা সত্যি নয় খঞ্জনা। ওরা বিয়ের আগে বিলেত গিয়ে নিজেকে বিয়ের যোগ্য করে দেশে ফিরে বিয়ে করেন। যেমন এই ডাঃ অমিতাভসেন। ইনি আমেরিকা থেকে 'চেষ্ট স্পেশালিস্ট' হয়ে এসেছেন। আমরা আছি সেই কুপমণ্ডুক হয়ে।

—তাহলে বিয়ের যোগ্য তো আপনি হয়েও পারলেন না মিহিরদা?

—কৈ আর হতে পারলাম? জীবনটা বৃথাই কাটলো। চল খঞ্জনা, এবার বাড়ি চল।

—চললেন নাকি? শুক্তি জিজ্ঞাসা করলো।

—হ্যাঁ। ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

খঞ্জনা আর মিহিরকে সকলকে নমস্কার জানাল। শুক্তি বললো,

—নমস্কার! আর একদিন আসবেন।

—চেষ্টা করব, জবাবে মিহির বললো। আর দেরি না করে খঞ্জনাকে নিয়ে এগুলো বাড়ির দিকে।

ওর মনে যেন একটা জ্বালা রয়েছে। খঞ্জনাকে ধন্যবাদ দিল মিহির সুন্দরভাবে কথা বলার জন্য। বললো,

—ওদের খুব ভালো কথা বলেছ তুমি খঞ্জনা। কোথায় শিখলে এমন সব কথা?

—এগুলো সব মিনির কথা। ঐ শুক্তির ওপর মিনির কী রাগ মিহিরদা? ও বলে, শুক্তি মানে ঝিনুক। জানিস ওর পেটে মুক্তো নেই। সব বের করে নিয়েছে। বাচ্চা ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে এখন ও

—তুমি কি বললে?

—শুধালাম, বাচ্চা ছেলেটা কে?

—তার উত্তরে মিনু কি বললো?

—বললো, তিনি আমাদের মিহিরদা।

হাসছে খঞ্জনা। মিহির কিন্তু হাসতে পারল না।

চিনি সত্যিই একটা কিছু লিখবে 'লোকসাহিত্য' বইটা অবলম্বন করে। আধ্যাত্মিকতা নিয়েই লিখবে। কিন্তু এ বিষয়ে তার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। তাই কয়েকটা ধর্মপুস্তক, যেমন—গীতা, চণ্ডী এবং আরো কিছু কিছু যোগবিজ্ঞানের বই আনিয়ে পড়বে। উদ্যোক্তা মিনি। সে দিদিকে সব রকমে সাহায্য করে।

চিনি বলে যায়, মিনি লেখে। মিনির হাতের লেখা খুব ভালো। মুক্তোর মতো গোটা-শোটা, এবং খুব দ্রুত সে লিখতে পারে। বর্তমানে দু'বোনের এটা একটা বিশেষ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ওরা এতে যথেষ্ট আনন্দও পাচ্ছে। যত অগ্রসর হচ্ছে, ততই যেন জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলে যাচ্ছে ওদের।

আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান এমন একটা বস্তু যার ভিতর অনুপ্রবেশ ঘটলে আনন্দের সীমা থাকে না। চিনি-মিনিরও তাই হলো। বিশেষ করে চিনির মধ্যে জীবন সম্বন্ধে যে একটা হতাশার ভাব জেগেছিল, তা যেন ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। মেঘমুক্ত আকাশের মতো নির্মল হয়ে উঠেছে তার অন্তর। জীবন-দেবতার অনাস্বাদিত মাধুর্য-রস সে এখন উপলব্ধি করতে পেরেছে। দৈহিক কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে যে একটা মানবিক-চৈতন্য সুপ্ত থাকে, সেই মানসিকতা জাগ্রত হচ্ছে।

প্রায় মাসখানেক মিহিরের কোনো খবর নেই। খবরের জন্য এখন আর ওরা কোনো চেষ্টাও করে না। হয়তো শুক্তির সঙ্গে মিহিরের বিয়ে হয়েছে অথবা শীঘ্রই হবে, এ নিয়ে কিছুমাত্র আর মাথাব্যথা নেই মিনির। দিদির মন অনেক-খানি জুড়োতে পেরেছে এই 'লোকসাহিত্য আধ্যাত্মিকতা'। প্রবন্ধ লেখা ও আলোচনা এতেই সে সন্তুষ্ট।

জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে নানারকম বই-পুঁথি সে সংগ্রহ করে আনে দিদির পড়ার জন্যে এবং নিজেও পড়ে। মিনি অবশ্য চিনির মতো বিদুষী বা প্রতিভাময়ী নয়, কিন্তু সংসর্গ একটা বড় সহায় মানুষের উন্নতির। মিনিও যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠলো। এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে লাগল দিদির সঙ্গে।

সেদিন সকালে হঠাৎ প্রভাতবাবু এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে খঞ্জনা। সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁদের বসালো মিনি আর চিনি।

লোকসাহিত্য নিয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা হলো এবং প্রবন্ধ যতটুকু

লেখা হয়েছে তা শোনানো হলো। শুনে প্রভাতবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বললেন,

—এ একটা কাজের মতো কাজ হচ্ছে। দেখে-শুনে খুবই খুশী হলাম। তোমরা দুটি বোনই জুয়েল।

—আর কাকাবাবু বলেন, আমি নাকি একটা জন্তু! খঞ্জনা অভিমানাহত কণ্ঠে বললো।

প্রভাতবাবু বললেন—না, মা, তুই জীবন-রস। তোকে আমার শুকনো ঘরে রসের সঞ্চার করব। একটু থেমে আবার বললেন—শোন মা চিনু-মিনু, ওর বাবার সঙ্গে কাল রাত্রে আমার পাকা হয়ে গেছে। আমার ছেলের জন্য ওকে চেয়ে নিলাম।

খঞ্জনা সলজ্জ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিনি বললো,

—শুনে আমরা খুব আনন্দ পেলাম কাকাবাবু। এ আমাদেরও সৌভাগ্য। আপনার ছেলে কি করেন?

—সেও আমরা খুব আনন্দ পেলাম কাকাবাবু। এ আমাদেরও সৌভাগ্য। আপনার ছেলে কি করেন?

—সেও শিক্ষাবিভাগে কাজ পেয়েছে। সরকারি চাকরি। আগামী মাসেই মাকে আমার ঘরে তুলব। এখন যদি পাড়াগাঁয়ে যেতে ওর আপত্তি না হয়?

—কিরে খঞ্জনা! তোর আপত্তি আছে নাকি?

প্রশ্নটা করলো মিনি। খঞ্জনা জানালো,

—আপত্তি কেন হবে? পাড়াগাঁয়েও তো মানুষ থাকে। আমিও থাকতে পারব।

—বিয়ে আমি কলকাতাতেই দেব মা। তোরা সব যাবি। চিনিকেও নিয়ে যাব। দুঃখের বিষয় এবারও মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা হলো না আমার।

—কেন? কোথায় তিনি খঞ্জনা। শুধোলো চিনি।

—কে জানে? মিহিরদা দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে হয়তো বিলেত বা আমেরিকা কোথাও গেছেন পড়তে, না-হয় বেড়াতে। কোনো পাত্তা নেই তাঁর। ওদিকে শুক্তির বিয়ে হয়ে গেছে ডাঃ অমিতাভর সঙ্গে। বেচারা মিহির।

খঞ্জনার কথাগুলো শুনলো মিনি-চিনি। মিনিই বললো,

—'ছাড়িয়া মুখের গ্রাস'..................সেই ঈশপের গল্প আর কি! যাক্

গে। হয়তো বিলেতী ডিগ্রী কিছু নিয়ে ফিরবেন। স্টাডি-লিভ নিয়েছেন বোধহয়।

প্রভাতবাবু বাইরে মিনির বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। নিমন্ত্রণ করলেন তিনি সকলকে এবং খঞ্জনাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

মিনি তাকিয়েছিল চিনির মুখের দিকে। বললো,

—মেয়েদের মন একটা আশ্চর্য জিনিস দিদি।

—কেন?

—দাগ পড়লে আর মোছা যায় না। তুই আজও ঐ হারামজাদাটাকে ভুলতে পারলি নে!

ছিঃ মিনু! অমন করে গালাগালি দিস নে। উনি আছেন আমার মনে। থাকুন না, ক্ষতি কি?

—কেন থাকবে? কেন রাখবি তুই ঐ শয়তানটাকে মনের মধ্যে পুষে? মিনির চোখ দুটো জ্বলে উঠলো সামলে নিয়ে বললো—তোর এই স্বর্গীয় প্রেম ঊর্ধ্বগামী কর দিদি—ঈশ্বরকে উৎসর্গ কর। ঐ একান্ত অযোগ্য অর্বাচীনকে দিবি তোর এই পবিত্র প্রেম? ছিঃ!

চিনি কিছুই বললো না। একটু পরে মিনি আবার বললো,

—তোকে এতদিন বলিনি! আমি সব খবর রাখি, এখন শোন।

—বল।

—পাটনা থেকে ফিরে তিন-চারদিন পরে মিহিরদা নিমন্ত্রণপত্র পায় ডাঃ অমিতাভের সঙ্গে শুক্তির বিয়ের। জীবনটায় বীতরাগ হলো। আত্মহত্যা করা সম্ভব হলো না। আইন আছে, পুলিস আছে। তাই লম্বা ছুটি নিয়ে চলে গেছে হনলুলু—পড়তে। এটা শুক্তিকে না পাওয়ার জন্য মনঃক্ষোভ! তোর জন্য নয়, বুঝলি?

—হুঁ!

অন্তরের কোন এক আর্ততার আড়াল থেকে 'হুঁ' শব্দটা বেরুলো চিনির। কিন্তু মিনি সে-স্বর শুনলো না। তার আগেই সে রেগে ছিটকে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। অসহায় চিনি একা পড়ে রইলো উদাস হয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে।

প্রভাতবাবুর সঙ্গে খঞ্জনা বাড়ি পৌঁছালো। আজ সে মিনিকে এক নতুন

চোখে দেখছে। মিনি তার বন্ধু। কিন্তু আজ সে মিনির মধ্যে একটা বিদুষীর অস্তিত্বের আবিষ্কার করেছে। মাকে গিয়ে বললো,

—শোন মা, একটা খুব আনন্দের কথা শোন।

—কি, কি কথা রে?

—দাদার বৌ ঠিক করে এলাম।

—কাকে ঠিক করে এলি?

—মিনিকেই দাদার বৌ করব।

—না। তা হবে না, কিছুতেই না। ও-কথা একদম বলিস নে। ওর নামে 'ঞ্জ' নেই।

—আছে। মিনি কি নাম হয় নাকি। আমার নাম খঞ্জনা? ওটা ডাক নাম। যেমন আমার ভালো নাম 'কুঞ্জলতা', তেমনি মিনির ভালো নাম 'মঞ্জুশ্রী'।

—অ্যাঁ! বলিস্ কি? সত্যি?

—হ্যাঁ। এখন কি করতে চাও বল? দেরি করলে তোমার 'ঞ্জ' চলে যাবে অন্য কারও বাড়ি। যত তাড়াতাড়ি পার ওকে ঘরে আনো।

—খুব ভালো। ও মেয়ে তো দেখা। তুই ওর মাকে বল যে, আমরা মঞ্জুশ্রীকে বৌ করতে চাই। তাঁরা রাজী হলেই হবে।

—খুব ভালো! আমি এখনি বাবাকে গিয়ে বলছি।

খঞ্জনা বাবার কাছে গেল। ওকে দিবাকরবাবু বললেন,

—হাসছিস কেন রে খঞ্জনা? কি হলো?

—মাকে ঠকাতে হবে বাবা! মিনিকে আনতেই হবে দাদার বৌ করে আর ভঞ্জ যখন দাদার উপাধি, তখন 'ঞ্জ' তো থাকবেই ওর নামে।

—হ্যাঁ। তা এখন কি করতে চাস?

—তুমি বিমলবাবুকে ফোন করে বল তোমার প্রস্তাব। তোমার তো বিমলবাবু খুব চেনা।

—তাই তো রে! বড়ই মুস্কিলে ফেললি!

—মুস্কিল কিসের?

—আমি ছেলের বাপ। আগেই প্রস্তাবটা করব?

—আমি করছি। বললেন প্রভাতবাবু। তিনি ডায়েল ঘুরিয়ে ফোন করলেন।

বিমলবাবু ফোন ধরে বললেন,

—আপনি নিশ্চয়ই দিবাকরবাবুর ছেলে অঞ্জনকে চেনেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে তো বিদেশ থেকে মুদ্রণ-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়ে এলো।

—হ্যাঁ। এখন আমার প্রস্তাব, আপনার ছোট মেয়ে মিনির সঙ্গে তার বিয়ে দিলে কেমন হয়? রাজী হবেন কি আপনি?

—কি বলছেন! রাজী হবো না কেন? এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।

—তাহলে প্রস্তাবটা আপনি দিবাকরবাবুর কাছে করুন।

নিশ্চয়ই করব। বাকিটা...

—বাকিটা আমি ঠিক করব।

বিমলবাবুকে প্রভাতবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন। ফোনটা তিনি রেখে দিতে গেলে খঞ্জনা বিমলাবাবুকে বললো,

—শুনুন কাকাবাবু। আপনি আজ বিকালে আমাদের বাড়ি এসে বাবা-মা'র কাছে প্রস্তাবটা করবেন। আর আমার একটা প্রার্থনা....

—বল। কি করতে হবে?

—আপনি মাকে বলবেন, আপনার মেয়ের ডাক নাম 'মিনি' ভালো নাম মঞ্জুশ্রী। নইলে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

—ও! তাই নাকি? কেন?

—কারণ, আমার মা'র বাতিক, নামের মধ্যে 'ঞ্জ' চাই। না থাকলে সে মেয়েকে মা ঘরে নেবে ন। ওর নাম মিনতি না হয়ে মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুবালা হোক।

—আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে মা।

ফোনের এধারে হাসছেন বিমলবাবু এবং ওধারে আর সকলেই। প্রভাতবাবু বললেন,

—তোমার নাম কি তারই জন্য কুঞ্জলতা হয়েছে?

—হ্যাঁ। মা রেখেছেন কুঞ্জলতা। বাবা রেখেছেন মঞ্জুলতা, আর দাদু নাকি রেখেছিলেন গুঞ্জমালা। সব 'ঞ্জ'-এর ছড়াছড়ি। সবই আমাদের গৃহ-দেবতা শ্রীশ্রীকরঞ্জাক্ষ মহাদেবের কৃপায়।

—সত্যিই কৃপা। আমারও ছেলের নাম রঞ্জিতকুমার, আর আমাদের গ্রামের নাম রায়গঞ্জ। কিঁ চমৎকার যোগাযোগ। উপাধি পাঞ্জা।

—ওই শুনেই মা তো অমন চট্‌পট্‌ রাজী হয়ে গেলেন।

বলেই খঞ্জনা পালালো।

দিবাকরবাবু আর প্রভাতবাবু হাসতে লাগলেন।

হনলুলুতে রয়েছে মিহির। কি একটা বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করছে। ভারতের খবর সে ভালোই রাখে। নিজেকে অতিশয় দীন মনে হয় তার।

চিনিকে হয়তো প্রভাতবাবু গ্রহণ করেছেন। যতটা শুনে এসেছে তাতে মিহিরের স্থির বিশ্বাস, প্রভাতবাবুই চিনিকে বিয়ে করবেন। এই কারণে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সে প্রভাতবাবুর সঙ্গে দেখা করেনি। মিনির মুখে প্রভাতবাবু যেটুকু গুণগাণ শুনেছেন তাই যথেষ্ট।

আজ নামকরা একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় একখানা বই-এর সমালোচনা পড়লো মিহির। লিখেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না একজন মনীষী। বইখানির নাম 'লোকসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা'। লেখিকা চিন্ময়ী দেবী। প্রকাশক প্রভাতরঞ্জন পাঞ্জা, রায়গঞ্জ, ইণ্ডিয়া, মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র, ইত্যাদি।

প্রভাতবাবুর সেই সংগৃহীত লোক-গাথা থেকে তাহলে চিনিই লিখলো প্রবন্ধ, যা মিহিরের কল্পনায় ছিল। না, কল্পনাটা চিনিরই। এ ভালোই হয়েছে। চিনিকে গ্রহণ করেছেন প্রভাতবাবু। উপস্থিত হয়তো চিনি আরোগ্য লাভও করেছে।

যাক্! চিনির বিষয়ে আর কিছু ভাবনার নেই মিহিরের। সন্তোষের কাছে এখন বলতে পারবে সে নির্দোষ। প্রভাতবাবুর উদয় মিহিরের উপকারের জন্যই। এতটা ভেবেও কিন্তু মিহির তার ঈর্ষাটা জয় করতে পারলো না।

প্রভাতবাবু না এলে নিশ্চয় মিহির আবার চিনির কাছে যেতে পারতো। হয়তো তাকে জীবনসঙ্গিনী করতে পারতো। চিনি তাকে নিশ্চয় ভুলে গেছে। কিন্তু কৈ, মিহির তো তাকে ভুলতে পারছে না এত চেষ্টা করেও?

হিসাব করে দেখলো মিহির, প্রায় দু'বছর সে দেশ ছাড়া। এখানকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অতঃপর দেশেই যাবে, নাকি ইউরোপ বা আমেরিকায় যাবে ভাবছে। নিজের দেশ ভারত থেকে অনুরোধ এসেছে যে, সে একটা সম্মানিত সরকারি কাজ পেতে পারবে। এখন তো আর দেশে যেতে তার

কোনো বাধা নেই। যাওয়া উচিত। দেশে তার কেউ না থাকলেও দেশমাতৃকা তো আছে। মনস্থির করল, দেশেই ফিরবে মিহির।

সঙ্গীহীন জীবনের বিড়ম্বনা বিস্তর। বিশেষত মিহিরের মতো কাব্যানুরাগী যুবকের পক্ষে। কিন্তু সঙ্গী অনায়াসে জুটিয়ে নিতে পারে। এখানেই তো শেলী, লোরা, ডোরা, ডালিয়া, কয়েকজনই রয়েছে। তাদের কাউকে বিয়ে করে দেশে ফিরলে কেমন হয়? তাহলে চিনির উপর একটা প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

কিন্তু মিহিরে চিন্তাশীল মন তৎক্ষণাৎ ভাবলো, চিনির উপর প্রতিশোধ কেন সে নেবে? চিনি তো কোনো অপরাধ করেনি। মিহিরই তাকে বঞ্চনা করেছে।

প্রতিশোধটা বরং শুক্তির উপর নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে শুক্তির কি এসে যাবে? কিছুমাত্র ক্ষতি সে অনুভব করবে না। বরং হাসবে। বলবে, স্বদেশে আর কোনো মেয়ে পেল না মিহিরদা। শেষে বিয়ে করলো এক বিদেশিনীকে। না, এরকম কিছু করবেনা মিহির।

মিস্ ডোরা হান্টার এসে অভিবাদন জানালো। মিহির তাকে অভ্যর্থনাও করলো। বললো,

—এস মিস্ ডোরা। তোমার ক্যামেরায় আমার ছবি কি ধরেছে?

—হ্যাঁ, অনেকগুলো। প্রায় ডজনখানেক হবে। নানা ভঙ্গিতে।

—ওগুলো কি করবে?

—এ্যালবামে থাকবে আমার ভারতীয় বন্ধুর স্মৃতি হিসাবে।

—স্মৃতির মূল্য শুধু ব্যথা-বেদনায় ভরা। ওসব রাখতে নেই ডোরা।

—স্মৃতি তো মধুময়ই হয়।

—না, হয় না। সর্বত্র সকলের মনেই স্মৃতির বেদনা জড়ানো। ও রেখো না। রাখলে দুঃখ বাড়বে।

—এ দুঃখ মহান। এই দুঃখকে মানুষ ছাড়তে চায় না বন্ধু। তাই স্মৃতি রাখে মনে, ঘরের কোণে, দেশের প্রকাশ্য স্থানে, সাহিত্যে, ইতিহাসে, গল্পগাথায়। ডোরা কথাগুলো বললো আবেগময় কণ্ঠে।

মিহির বললো,

—দুঃখ, দুঃখই। তাকে মহান বলে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করো না। যে

স্মৃতি ব্যক্তিগত, তা সর্বত্রই দুঃখের। যখন আমি চলে যাব, তখন হনললুর স্মৃতি আমার মনকে পীড়াই দেবে ডোরা।

—তাই তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে চাও?

—ভুলতে পারলে তো ভালো হয়।

ডোরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো,

—ভোলা তো যায় না বন্ধু।

—না। কিন্তু ভুলে যাওয়াটা আমি আশীর্বাদ মনে করি।

—তুমি আমাদের সকলকে ভুলেই যাবে বন্ধু। এ সত্যটা এমন করে না বললেই তো ভালো হতো। ভুলে যদি ভালো থাক, তবে ভুলে যেও, কিন্তু যাদেরকে ভুলবে তাদের নাই-বা জানালে সে-কথা। তোমার মন শক্ত মন তাদের নাও হতে পারে।

ডোরার অনুযোগটা কোনদিক দিয়ে যাচ্ছে বুঝলো মিহির। বললো,

—তোমাদের কথা বলছিনে ডোরা। স্মৃতি ভোলা যায় না, তাই বলছি। সুস্থ কোনো মানুষের পক্ষে স্মৃতিকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। আর এই স্মৃতি বেদনাই বাড়ায়। একে পরিহার করা অসম্ভব। যাক্, এবার অন্য কথা বল।

—অন্য কথা কি আর বলব! তোমার যাবার দিন কি ঠিক হয়েছে বন্ধু?

—না। বোধহয় এই মাসের শেষের দিকে যাব।

—ভারতে?

—হ্যাঁ।

—গিয়ে নিশ্চয়ই বিয়ে করবে?

—না।

—বাকি জীবনটা কাটাবে কি করে?

—এ জীবনটা কুমার থেকে যেতে চাই।

—কেন?

—কারণ, আমি একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম। একটি অসহায় ইনভ্যালিড্ মা-বাপ-হারা মেয়ে।

ভালোবেসেছিলে এক ইনভ্যালিড্ মেয়েকে?

—হ্যাঁ। তাকে 'ভালোবাসি' বলতে আমি গর্ববোধ করতাম। কিন্তু আমার সে গর্ব চূর্ণ হয়ে গেছে।

—কি জন্য?

—অন্য একটা মেয়ে আমাকে মোহগ্রস্ত করেছিল তার রূপযৌবনের হাত ছানিতে। তার অর্থগৌরব, তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, তার কৌলিন্য, আমার এই পবিত্র প্রেমে পদাঘাত করেছে। আমি অমানুষ!

—সে-মোহ তো এখন ভেঙেছে তোমার?

—হ্যাঁ। কুকুরের মতো লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে সে।

—ভালো এখন সেই পবিত্র প্রেমাস্পদা ইনভ্যালিড্ মেয়েটিকে গ্রহণ করো গে!

—তার কাছে যাবার মুখ আমার নেই ডোরা। কোন লজ্জায় যাব। তার ওপর আর হয়তো আমার অধিকারও নেই। সে এখন হয়তো অন্যের অঙ্কশায়িনী।

ডোরা শুনে গেল। কিছু আর বললো না। তার নিজের যেটুকু আশা ছিল তা নির্বাপিত হয়ে গেছে। কাজেই একটু পরে সে বিদায় নিল।

মিহির ইচ্ছে করেই কথাগুলো বললো ডোরাকে। চিনির মধ্যে আশা জাগিয়ে সে অপরাধ করেছে। আর কারো মনে কোনো আশা জাগাবে না সে। সে এখন কঠিন-কঠোর বুক-ওয়ার্ম হয়ে যাবে। জীবনের রসকষ সবই ঢেলে দেবে পড়াশুনায়—পঠন-পাঠনে, শিক্ষায় আর শিক্ষকতায়। জ্ঞান অর্জনে, আর জ্ঞান বিতরণেই হোক এখন তার জীবনের স্থিতি।

মিহির যথারীতি দেশে ফিরবার আয়োজন করলো। নির্দিষ্ট দিনে রওনা হয়ে ফিরে এলো দেশে। স্বদেশের স্নিগ্ধ শ্যামলতা ওকে ডাকছে।

সমুদ্রতরঙ্গের দেশ হনলুলুকে ভালই লেগেছিল মিহিরের। কিন্তু দুয়ের মধ্যে তফাৎ অনেক। সেটা মোহ, যেন ঐ যৌবনের হাতছানি। আর এটা প্রেম, অবিনশ্বর, অবিস্মরণীয়।

দিবাকরবাবুকে চিঠি লিখেছিল ফিরে আসার সংবাদ দিয়ে। তার ফ্ল্যাট ঠিক করাই ছিল। এ যাবৎ ভাড়া দিয়ে আসছে সে ঠিকমতো। এরোড্রাম থেকে সোজা এসে সে উঠলো তার ফ্ল্যাটে।

মিহির ভেবেছিল, কেউ না এলেও অন্ততঃ খঞ্জনা আসবে অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু কেউ এলো না। শুধু দিবাকরবাবু নীচে ছিলেন, বললেন,

—এস মিহির, এস। শরীর ভালো তো? ওদেশের শিক্ষা শেষ হলো?

—হ্যাঁ। শরীরও ভাল।

—আচ্ছা, এবার যাও, বিশ্রাম করো গে।

নিজের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকল মিহির।

ছোট্ট ফ্ল্যাট মিহিরের। মাত্র দু'খানা ঘর নিয়ে সে থাকে। সবই ঠিক আছে যেখানে যা ছিল। শুধু ধূলো জমেছে সর্বত্র। ঝাড়ু দেবার কেউ তো নেই। ঘর বন্ধ না থাকলে দিবাকরবাবু ঘরখানা নিশ্চয় পরিষ্কার করিয়ে রাখতেন। যাক, এখন মিহির নিজেই সব করে নেবে। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর বটে।

বারান্দায় দিবাকরবাবুর চাকরটাকে হঠাৎ দেখতে পেল মিহির। তাকে দেখেই বললো সে,

—ঘরটা একটু ঝেড়ে-মুছে দিবি?

—আজ্ঞে দাদাবাবু, চাবি ছিলনি। পেলে করে রাখতাম। আমি এখনি সব করে দিচ্ছি, আপনি বারান্দায় এসে বসেন।

—না। আমি বাইরে যাচ্ছি। তুই ঝাঁট দিয়ে রাখ।

মিহির চলে গেল তার লাগেজগুলো তোলবার জন্য। ফিরে এসে দেখলো সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন দিবাকরবাবু পত্নী রঞ্জিতা দেবী। মিহির প্রণাম করলো তাঁকে। রঞ্জিতা দেবী বললেন,

—এস। বেশ ভালো ছিলে তো?

—হ্যাঁ। খঞ্জনা কোথায়?

—শ্বশুরবাড়িতে। ওর একটা খোকা হয়েছে।

—বাঃ! শুনে খুব সুখী হলাম। কোথায় শ্বশুরবাড়ি? আমি দেখতে যাব খোকাকে।

—যেও। খঞ্জনার শ্বশুরবাড়ি কলকাতায় নয়। পশ্চিম দিনাজপুর—রায়গঞ্জে।

—জামাই কি করেন?

—জামাই সরকারি শিক্ষাবিভাগে কাজ করে।

—বাঃ! আপনি কথামতোই কাজ করেছেন—'ঞ্জ' আছে।

হাসছে মিহির। কিন্তু গম্ভীর হয়ে রঞ্জিতা দেবী বললেন,

—হ্যাঁ। আর বৌ করেছি মঞ্জুমালাকে। মানে, তোমার ছাত্রী মিনিকে।

—বলেন কি! কৈ সে?

—বাপের বাড়িতে আছে। ওর দিদি কি একটা বই লিখে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেল, তাই দেখতে গেছে।

মিহির আর কিছু শুধালো না। রঞ্জিতা দেবীও আর কিছু বললেন না।

সংবাদপত্রে মিহির জানতে পারলো, বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখক-লেখিকাকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বাংলার চিন্ময়ী দেবী পুরস্কার পেয়েছেন দশ হাজার টাকা, 'লোকসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা' বইখানির জন্য।

কাগজে চিন্ময়ীর একটা ছবিও ছাপা হয়েছ তার সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ। তাতে চিন্ময়ী কুমারী কি বিবাহিতা কিছু লেখা নেই। শুধু লেখা আছে তার পঙ্গুত্বের কথা এবং সেই অক্ষমতাকে অতিক্রম করেও তার আশ্চর্য জীবনীশক্তির কথা, যার বলে সে এই পুরস্কার লাভ করলো।

চিনিকে অভিনন্দন জানানো উচিত। ভাবছে মিহির। জানাবার অধিকার কি আছে তার এখনও? প্রশ্নটা ঘুরে ঘুরে আসছে মনের মধ্যে।

নীচে মোটর থামার শব্দ শুনে জানলা দিয়ে দেখলো মিহির, মিনি নামছে।

একটু পরেই উপরে এলো মিনি। সটান মিহিরের ঘরে। ওকে দেখে মিহির বললো,

—এসো। ভালো আছো? বাড়ির সব ভালো?

—হ্যাঁ। আপনি ভালো তো? আপনার ওখানকার কাজ শেষ হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। কাগজে দেখলাম, তোমার দিদি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেল। খুব আনন্দের কথা।

—ধন্যবাদ।

মিনি আর কিছু বললো না।

মিহিরও অন্য কোনো প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ বোধ করছে। কিন্তু এবার মিনি চলে যাবে। তাই কিছু একটা বলা উচিত ভেবে মিহির প্রশ্ন করলো,

—প্রভাতবাবু কি কোনোরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন?

—কার জন্য?

—চিনির জন্য।

—চিনির জন্য? কি সব বলছেন আপনি? তিনি কেন চিনির জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে যাবেন?

— প্রভাতবাবু চিনিকে বিয়ে করেননি?

—আশ্চর্য মানুষ আপনি! কি আবোল-তাবোল বলছেন? আপনি ভেবেছেন, আপনার মেকি প্রেমের প্রতিশোধ নিতে দিদি বিয়ে করেছে প্রভাতবাবুকে! শুনুন, প্রভাতবাবু খঞ্জনার শ্বশুর—আমাদের পূজনীয় কাকাবাবু। বয়স তাঁর পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। বর্তমানে তিনি নাতির ঠাকুরদা হয়েছেন।

মিহিরের মুখখানা ছাই-এর মতো সাদা হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি বললো,

—আমি জানতাম না মিনু, কিছুই জানতাম না। আমায় মাফ কর তুমি।

—মাফ! মাফ আপনাকে কোনোদিন আমি করব না। না জেনে দিদির সম্বন্ধে এমন ধারণা করেন কি করে? আপনার মত শঠ-লম্পটকে ভালোবেসে আমার সুদ্ধ-সুন্দর, সতী-সাবিত্রী দিদি শীতের পদ্মের মতো ঝরে গেল। প্রেমের দেবতা যেন আপনাকে মাফ করেন। আমি করবো না-কোনোদিনও না!

চলে গেল মিনি সদম্ভে।

চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়লো মিহির। সমস্ত হৃদয়-মন তীব্র একটা আনন্দের মাদকতায় আচ্ছন্ন হয় উঠেছে। অপ্রতিরোধ্য তার গতি অবসন্ন করে দিয়েছে মিহিরকে।

এর জন্য মিহির মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বরং উল্টোটাই সে আশা করেছিল। নিজেকে সামলাতে যথেষ্ট সময় লাগলো তার।

এখন ইতিকর্তব্য স্থির করতে হবে। কর্তব্য তো স্থির করাই আছে—চিনিকে বিয়ে করা, আর কথাও পাকা হয়েই আছে। কিন্তু মিনি যা বলে গেল, কে জানে, চিনি যদি তাকে অবিশ্বাস করে, যদি আর মিহিরকে গ্রহণ করতে না চায়? চিন্তার কথা।

চিনি তো এখন সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা। কে জানে, কোন্ অজ্ঞাত রহস্য লুকানো আছে তার ভবিষ্যতে? হয়তো যোগ্যতম কোনো ব্যক্তি আসবেন চিনিকে গ্রহণ করতে! না, না, এসব কি ভাবছে মিহির!

মনকে তীব্র তিরস্কার করলো মিহির, মিনির কথাগুলো মনে করে ঃ'আপনার মতো শঠ-লম্পটকে ভালোবেসে আমার শীতের পদ্মের মতো ঝরে গেল'।

চিনি যে কেমন আকুল ভাবে অপেক্ষা করছে মিহিরের জন্য, তা এই কথা কটাতেই প্রকাশ পেল। চিনি তাকে ভোলেনি, ভুলবে না, ভুলতে পারে না।

চিনিকে একটা অভিনন্দন নিশ্চয় জানানো উচিত মিহিরের। উচিত ছিল তার অনেক আগেই এটা জানানো।

উত্তেজনায় উঠে পড়লো মিহির চেয়ার ছেড়ে। কয়েক পা এগুলো দিবাকরবাবুর ঘরের দিকে। ইচ্ছে, ফোন করবে। কিন্তু সরাসরি চিনির সঙ্গে কথা বলতে সাহস হলো না মিহিরের। ফিরে এসে চিনিকে চিঠি লিখতে বসল ঃ

কল্যাণীয়াসু,

আশা করি ভালো আছ। আমি কাল ফিরেছি। সংবাদপত্রে তোমার সাফল্যের সংবাদ পেয়ে পরম আনন্দ পেলাম। উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করে জীবন ও জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত কর। ইতি—

মিহির

চিঠিখানা লিখে বার দুই পড়ে ডাকে ছেড়ে দিল মিহির। তারপর যোগ দিল গিয়ে তার নবলব্ধ চাকরিতে।

চিনির সঙ্গে দেখা করতে যাবার দুঃসাহস মিহির অর্জন করতে পারছে না। যদিও জেনেছে, চিনির প্রেম অটুট, অভেদ্য ও অবিচ্ছেদ্য। তবু মনে হয়, মিহির নিজে অপরাধী, অবিশ্বাসীও। কোন্ মুখে সে যাবে?

মিহিরের ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন। ডাকে একখানা নিমন্ত্রণপত্র এলো। মিনি আর হিরণ তাদের দিদিকে অভিনন্দিত করবে, এ তারই নিমন্ত্রণ!

উত্তম সুযোগ। মিহির এই নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করবে এবং যাবে চিনিকে দেখতে। এই অজুহাতে হয়তো চিনির সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে পারে। না উঠুক, চিনিকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে হয় তার। সেই ইচ্ছেটা অন্তত পূরণ হবে।

কে জানে, কেমন আছে চিনি? হয়তো আরো রোগা হয়ে গেছে সে। হওয়াই স্বাভাবিক! কারণ, পড়াশুনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় তাকে।

খবরের কাগজে রবিবাসরীয় সংখ্যায় চিনির লেখা একটি ভালো প্রবন্ধ বেরিয়েছে। সেটা পড়েছে। যথেষ্ট পড়াশুনা না করলে ওরকম উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ লেখা যায় না।

চিনির প্রতিভা আছে। মিহির হয়তো তাকে আরো কিছুটা এগিয়ে দিতে

পারতো। শারীরিক অক্ষমতাকে নিজের সুস্থ-সবল দেহ-মন দিয়ে পূর্ণ করতে পারত। কিন্তু তা আর হবার নয়। তবু এই নিমন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণ করবে মিহির।

মিহির উত্তর দিল পত্রটার। যাকে বলে আর. এস. ভি. পি.। লিখলো, সে যাবে। আসবেন লিখেছেন। কে আসবেন না গুণে একটা লিষ্ট করে খাবারের আয়োজন করতে হবে। মিহিরের নিমন্ত্রণ গ্রহণের পত্রটা দেখল মিনি।

সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠলো মিনির। বললো,

—শুনেছিস দিদি! তোর উনি আসছেন।

—কে?

—সেই শয়তান, সেই ভন্ড কাপুরুষটা। সেই মিহির নামক শয়তান জানোয়ারটা।

—ওসব কথা থাক মিনি। কি লিখেছেন তাই বল।

—লিখেছেন আসবেন। স্পর্ধা বটে। কোন সাহসে আসবেন তাই ভাবছি।

—নিমন্ত্রণ করেছিস তো! তাই আসবেন লিখেছেন। অপরাধটা কোথায়?

—আমাদের কর্তব্য, তাই নিয়ন্ত্রণ করেছি। এ বাড়িতে ওর ঢোকাই অপরাধ।

চিনি আর কিছু বললো না।

মিনি তাকিয়ে দেখলো চিনির দিকে। চিনি নিঃশব্দে চেয়ে আছে আকাশের পানে। সে সখেদে বললো,

'এত প্রেম সখী এত ভালোবাসা
কেমনে আছে সেপাশরি—
সেথা কি বহে না মলিন সমীর
সেথা কি বাজে না বাঁশরী!'

চিনির চোখে জল টল্‌টল্ করছে চেয়ে দেখলো মিনি। উঠে এসে ও দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো চিনিকে নিবিড়ভাবে। কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বললো,

—আমি ওকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিনে দিদি।

—কেন পারছিস নে?

—তোর এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে যে তোকে এমনি করে বঞ্চিত করলো, তাকে ক্ষমা করা যায় না—যায় না দিদি।

শান্তকণ্ঠে চিনি বললো মিনিকে,

—করিস নে ক্ষমা। কিন্তু তার অপরাধ নেই!

—নেই!

—না।

—কেন?

—কারণ আমার মতো অক্ষম একটা মেয়ে কারও জীবনসঙ্গিনী হতে পারে না মিনু। তিনি ঠিক করেছেন। আমি বরং সর্বান্তঃকরণে চাইছি তিনি বিয়ে করুক; করে সুখী হোন। আমার ভালোবাসা আমার কাছে—আমারই থাক।

মিনি নির্বাক হয়ে রইল। নিঃশব্দে নীচে চলে গেল। বুঝলো, মিহিরের উপর চিনির কোনো অভিযোগ নেই, কোনো অনুযোগও নেই। আপন ভাগ্য নির্বিকার চিত্তে মেনে নিয়ে চিনি প্রিয়তমের সুখই চায়। আর কোনোদিন কোনো ব্যথা দেবে না মিনি চিনিকে; ঠিক করলো মনে মনে।

সেদিন ছাদের উপর আয়োজন করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রিতের সংখ্যা বেশি নয়। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবীর মধ্যে ডাঃ সত্য রায়, শুক্তি, অমিতাভও আছেন। আর বাইরের লোকদের মধ্যে কয়েকজন সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। প্রধান অতিথি প্রভাতবাবু।

সবাই এসে পৌঁছলেন একে-একে। সব শেষে এলো মিহির। বসলো এক কোণায়।

উদ্বোধন সঙ্গীত হলো। আমোদ-প্রমোদ হলো। উপস্থিত ব্যক্তিদের ভাষণও যথানিয়মে ভাষিত হলো।

সব শেষে সভাপতি মিহিরকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

মিহির বললো—আমার কিছু বলবার নাই। এই পরিবারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। শ্রীমতী চিনির প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ওকে জীবনের সাথী করতে চেয়েছিলাম। সম্মতিও পেয়েছিলাম। তারপর কি কুক্ষণে জানি না, আমি মোহগ্রস্ত হই। সে মোহ আমার ভেঙেছে। আর আমি জানতে পেরেছি, আমার ওপর চিনির ভালোবাসা আজও অপরিমান। আমি অপরাধী। আপনাদের সকলের কাছে আমার অপরাধ স্বীকার করে মার্জনা চাইছি। আর সেই সঙ্গে প্রার্থনা করছি, আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় যেন আমি চিনির

যোগ্য হতে পারি—জীবনের, জন্মান্তরের সাথীরূপে, তাকে যেন লাভ করতে পারি।

চিনি পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। কথাগুলো সে সবই শুনলো। সকলেই চেয়ে আছে তার দিকে। কেউ কোনো কথা বলছে না। ডাঃ সত্য রায়ই হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলো,

—থ্রি চিয়ার্স্ ফর.....

না, না, ইংরেজি নয়। বাংলায় বলা হোক, আমরা সর্বান্তকরণে দম্পতীর শুভকামনা করি।

আকাশ ছেয়ে মেঘ উঠেছে। চৈত্র-বৈশাখের কর রৌদ্রের পর মেঘমেদুর আকাশ। বৃষ্টি হতে পারে। তাই অতিথিদের মধ্যে কে একজন বললেন,

—বৃষ্টি আসছে। এবার চল সব। মধুরেণ সমাপয়েৎ তো হলো। এবার বাড়ি চল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এবার চল সব।

সবাই চলে যাচ্ছে! শেষে মিনিও যাচ্ছে। যাবার সময় সে মিহিরকে বলে গেল,

—আজ আপনাকে ক্ষমা করলাম।

মিহির এগিয়ে এসে ধরলো চিনির হাতখানা—দুর্বল, অসুস্থ হাত। সাদরে হাতটা টেনে নিয়ে বললো,

—বৃষ্টি আসবে, ঘরে এসো।

চিনি কোনো কথা কইতে পারছে না। অনেক চেষ্টা করে বললো,

—আমাকে দিয়ে কি কাজ হবে?

—না-হয় না হবে। তবু আপনার ধন কেউ ফেলে দেয় না। চল, তোমায় ঘরে নিয়ে যাই।

আর আপত্তি করলো না চিনি। হাত ধরেই ওঁকে ঘরে আনলো মিহির বললো,

—কাল আবার আসব।

বেরুচ্ছে মিহির। চিনি দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওকে একটু আলতো ভাবে ছুঁয়ে মিহির এগুলো। দৃষ্টি তখনও ওর পানে।

আকাশ জোড়া কাজল-কালো মেঘ। হঠাৎ তারই বুক চিরে নিমেষের চোখ ধাঁধানো একটা আলোর ঝলকানি। পরমুহূর্তে তীব্র বজ্রপাত—কক্কড়—কক্কড়—কড়াৎ।

চমকে উঠলো মিহির। চিনিও। পঙ্গু চিনি ভুলে গেছে সে পঙ্গুত্ব। ছুটে এসে সে ধরে ফেললো মিহিরকে।

—না-না। তুমি যেও না, যেও না।

বলে, চিনি আতঙ্কে দু'হাত দিয়ে সবলে জড়িয়ে ধরলো মিহিরজেক। মিহির আশ্চর্য হয়ে গেল। বললো,

—একি! তুমি ছুটে আসতে পারলে?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য তো! কী করে এটা সম্ভব হলো চিনি?

—তাই তো ভাবছি।

—কোনোদিন তো ডান-অঙ্গে কোনও কাজ করনি?

—না। ছোটবেলায় ডাক্তারের নিষেধের পর থেকে ডান-অঙ্গ চালাবার চেষ্টাই করিনি। ভয় করতো।

—ঐ ভয়টাই তোমাকে এতকাল ভুগিয়েছে। বজ্র আজ তোমার ভয়ঙ্কর ভয়টুকু ভেঙে দিল। বজ্রকে ধন্যবাদ। এসো, আমরা ওই সূর্যদেবতাকে প্রণাম জানাই।

চিনি সত্যিই সুস্থ মানুষের মত দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো সূর্যদেবকে।

আকাশে তখন বিদ্যুতের দীপ্তি মৃদু-মৃদু হাসছে।